সূচী পত্র।

উৎসর্গ।

পরম পূজ্যপাদ ৺ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় পিতৃঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু—

স্বর্গীয় পিতৃদেব !

শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে এই পুস্তকখানি আপনার দেবচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। আপনি, নরজন্মে বিষয় কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, যে অনঘ দেবচরিত্র বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাও যদি এই পুস্তকে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা শুভপ্রদ হইবে।

প্রণত সেবক
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

ভুমিকা।

"পতাকা" ও "নব্যভারতে" আমার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কতকগুলি এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে ইহার মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধ কোনও কোনও সম্মানিত সম্পাদক তাঁহাদিগের পত্রে পুনর্মুদ্রিত করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। যাহা হউক এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রবন্ধ-লহরী।

অপমান কাহাকে বলে?

প্রভাত হইল। প্রভাতের শীতল বায়ু, মধুর সম্ভাষণে, পুষ্পগুলিকে জাগাইতে লাগিল। কলকণ্ঠ পিককুল আনন্দে ছুটিয়া ছুটিয়া, আকাশে সঙ্গীত ছড়াইতে লাগিল। অবনী সুখে হাসিল। আমাদিগের সেই নির্জ্জন উদ্যান-বাটীতে আমি প্রভাতের এই পবিত্র শোভা দেখিতেছিলাম। সেই প্রাভাতিক মধুরতার হাসি-হাসি ঢেউ আমার হৃদয়ে আসিয়া লাগিতে ছিল—তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত জীবনের শত দুঃখ ভুলিয়া ভাবিলাম, বাঁচিয়া থাকা ত বেশ, পৃথিবীত খুব সুখের স্থান। এমন সময় আমার একজন বন্ধু সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখখানি স্বভাবতই গম্ভীর, ললাট প্রশস্ত, দেখিলেই বোধ হয় লোকটী চিন্তাশীল। তাঁহার শিক্ষা উচ্চ, বুদ্ধি মার্জ্জিত, জন্ম ব্রাহ্মণবংশে সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "ভাই, আজি এক জোড়া জুতা দিতে পার? আমার কয় দিন জুতা নাই।" তাঁহার পায় জুতা ছিল না তাহা আমি প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, এখন করিলাম। আমি বলিলাম, "বসুন"।—সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত লোক—পায় জুতা নাই—আমার নিকট জুতার ভিখারি! আমি কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,

"জুতা?" তিনি যে উত্তর দিলেন তাহাতে বুঝিলাম, সাধারণ হিতের জন্য কোন একজন ধনী ব্যক্তির নিকট তাঁহাকে যাইতে হইবে। পায় জুতা না থাকিলে দ্বারবান্ তাঁহাকে ঢুকিতে দিবে কি না সন্দেহ, সুতরাং এক জোড়া জুতার আশু প্রয়োজন। এই কথার পর, প্রভাতের সেই সুখের ঢেউ চলিয়া যাইল। তাহার পরিবর্ত্তে বিষাদ চিন্তার ঢেউ আসিল। অদ্যও অনেক দিনকার সেই কথা মনে হওয়ায় বিষাদের ঢেউ আবার মনে আসিতেছে। কেন, এখন তাহা বুঝাইলাম না। আমার নিকট অম্লানবদনে জুতা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেথানে আরও লোক ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কি মনে করিবেন তাহা তিনি ভাবিলেন না, জুতা ভিক্ষা করাতে তাঁহার অপমান হইবে তাহা মনে করিলেন না। তিনি জুতা লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইলেন। তিনি চলিয়া গেলে একজন বলিলেন "মহাশয়, এইরূপ ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করা কিন্তু—বড় লজ্জা ও অপমানের বিষয়।" আমার মনে হইল, অপমান ও লজ্জা—কাহার? যিনি জুতা চাহিয়া লইয়া যাইলেন তাঁহার, না আমার? যিনি পরহিতব্রতে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্দীপনায়, সুখ-সম্পদের আশা, চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়া অদ্য অন্যের দ্বারে ভিখারি, তিনি নিতান্ত নির্ধন হইয়াও ধনী—তাঁহার জীবনে যে মাহাত্ম্য আছে, অন্তঃকরণে যে রত্নরাশি আছে, ধনিজনের মধ্যে তাহা কয় জনের আছে। আমার মনে হইল, ইনি ভিক্ষারি হইয়াও দাতা, আমি দাতা হইয়াও ভিখারি। এক জোড়া অকিঞ্চিৎকর জুতা ভিক্ষা করিয়া, আমাকে মহামূল্য শিক্ষা দিয়া যাইলেন। জীবন যে বিলাস-সম্ভোগ নহে, কেবল

প্রভাত-বায়ু সেবন নহে, সংসার যে সুখশয্যা বা আলস্যমঞ্চ নহে, সংসার যে রণক্ষেত্র—যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যের তূরীধ্বনি শুনিয়াও এই রণে যোগ দিতেছে না সে যে কাপুরুষ, তাহার জীবন যে ঘৃণার ও অপমানের জীবন—আমার জীবন যে অপমানের জীবন, আর ইঁহার জীবন যে মানের জীবন—এই কথা তিনি ফরাসি উপন্যাস "লে মিজেরেবল্" (Les Miserables) এর মহর্ষি বিশপের ন্যায় বক্তৃতা না করিয়া নীরবে আমাকে শিখাইয়া দিয়া চলিয়া যাইলেন। "আপনার মান আপনার কাছে" এই প্রচলিত কথার গভীর মর্ম্ম কতক বুঝিতে পারিলাম। অন্য লোকে কি বলে, কি ভাবে তাই ভাবিয়া ভাবিয়াই আমরা মরি। কেহ প্রশংসা করিল, অমনি হর্ষে নাচিয়া উঠিলাম, কেহ নিন্দা করিল, অমনি বিষাদে ডুবিয়া যাইলাম—হর্ষ বা বিষাদের উপযুক্ত কারণ আছে কি না তাহা ভাবি না—অন্যের কথার উপর, অন্যের বিশ্বাসের উপর, নিজের সুখদুঃখ সংস্থাপিত করি—নিজের মান অপমান অন্যের হস্তে ন্যস্ত রাখি।

"আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই কেবল আমার মনে করা আবশ্যক, অন্যে যাহা ভাবিবে তাহা মনে করা আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই"—এই মহাপুরুষবাক্য জানিয়াও তাহা সতত মনে রাখিতে পারি না। যদি কখন নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানে, সমাজের মতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে যাই, সত্য বা বিশ্বাসের অনুরোধে সাধারণের কোন অপ্রিয় কথা বলিতে চাই—এমনি ভীরু মন, সমাজ ও নিন্দার ভয়ে অগ্রসর হইতে পারি না। সমাজে আমার "মান" যাইবে, এই ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ি। নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া, অথবা নিজে সরল

বিশ্বাস গোপন করিয়া, যে "মান" সঞ্চয় বা রক্ষা করিতে হয় তাহা মান নহে, তাহা অপমান, অথবা অপমান অপেক্ষাও কোন ঘৃণিত বস্তু, ইহা নিতান্ত সত্য। আর যে "অপমান" কর্ত্তব্য-কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী অনুচর তাহা অপমান নহে, তাহা অতি উচ্চশ্রেণীর মান।

তুমি রেলওয়ে গাড়িতে যাইতেছ, দেখিলে একজন বিদেশী অসুর একটি নিঃসহায়া অবলাকে আক্রমণ করিল। তোমরা সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া তাহার রক্ষার্থে এক পাও অগ্রসর হইলে না, আর,একটি বালক তাহা দেখিবামাত্র,নিজে দুর্ব্বল জানিয়াও তীরবেগে ছুটিয়া আপনার সমুদয় বল ক্ষুদ্র মুষ্টিতে সংগ্রহ করিয়া, সেই অসুরের সহিত যুঝিতে লাগিল।—অবশ্য পারিল না। অসুর তাহার বজ্রমুষ্টিতে শীঘ্রই বালককে ফেলিয়া দিল, পদাঘাত করিল—বালক ভূতলে লুণ্ঠিত, তাহার কোমল কপোল শোণিতাপ্লুত। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে অপমান কাহার? তোমাদিগের, পুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান কাপুরুষদিগের,—না ধূলিলুণ্ঠিত, পদাহত, রুধিরাক্ত বালকের? মান অপমানের জ্ঞান অধুনা বাঙ্গালীর মধ্যে কাহার কিরূপ তাহা জানি না। অন্যে যাহাই মনে করুন, আমিত ঐ পদাহত বালকের পদরেণু আমার মস্তকে লইতে পারিলে আমাকে ধন্য ও পূত মনে করি।

যাহা অন্যায় ও অধর্ম্ম তাহা করাই অপমান, আর যাহা ধর্ম্ম ও ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তী হওয়াই মান।

প্রতিকার প্রতিহিংসা নহে।

"At a certain stage of his progress the man fights, if he be of a sound body and mind. At a certain high stage he makes no offensive demonstration, but is alert to repel injury, and of an unconquerable heart. At a still higher stage he comes into the region of holiness; passion has passed from him; his warlike nature is all converted into an active medicinal principle; he sacrifices himself, and accepts with alacrity wearisome tasks of denial and charity; but being attacked, he bears it, and turns the other cheek as one engaged, throughout his being, no longer to the service of an individual but to the common good of all men."

সংসারে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটী বড়ই বলবতী, কি মানুষের মধ্যে বল, কি পশুদের মধ্যে বল। যেমন চড়টী মারিল অমনি চাপড়টী মারিতে কেমন ইচ্ছা করে, যতক্ষণ চাপড়টী না মারিতে পারি, ততক্ষণ যেন গার জ্বালা জুড়ায় না। কেহ একটা শক্ত কথা বলিল, অমনি প্রত্যুত্তরে তাহাকে তেমনি শক্ত বা ততোধিক শক্ত কথা বলিয়া ফেলি—যদি দৈবাৎ কাহারও গার ঘেঁস লাগিল অমনি সর্পের মত তাহাকে ফোঁস করিয়া দংশন করি, দুঃখের বিষ তাহার জীবনের শিরাতে ঢালিয়া দেই। জানিনা এ জীবনে প্রতিহিংসা বা ক্রোধের বশে কত কোমল হৃদয়কে আঘাত করিয়াছি। কতবার ভাবি, প্রতিহিংসা একবারে পরিত্যাগ করিব, ক্রোধকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিব। কই, তা ত পারি না। যাহাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসি, যে প্রাণের অপেক্ষাও আমাকে ভালবাসে, সে আমাকে একটা কথা

বলিল,একটু অনুচিত অসহিষ্ণুতা দেখাইল, আমি অমনি তাহার অপেক্ষা শতগুণ অসহিষ্ণুতা দেখাইলাম। যে মরিয়া যাইলেও আমাকে কখন কঠিন কথা বলে নাই,যাহার কোমল হৃদয় আমি যন্ত্রণার শলাকায় পুনঃপুনঃ বিদ্ধ করিলেও কখন আমাকে কর্কশ ভাষায় কথা কহে নাই,—যে আমাকে এক বিন্দু সুখ দিবার জন্য নিজে এক সমুদ্র দুঃখ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সতত প্রস্তুত—আমি এমনি অধম যে সেও যদি একদিন একটা কথা না বুঝিয়া বলে, একটা কাজে বিবেচনার চুক করিয়া ফেলে, না বুঝিয়া অসময়ে আমার গতির একটু ব্যাঘাত দেয়, আমি অমনি, ক্ষণ-কালের জন্য সব ভালবাসা ভুলিয়া, কুপিত বাক্যের তীক্ষ্ণ নির্ম্মম ছুরিকা তাহার বুকে বসাইয়া দেই। তার কোমল প্রাণ তাতে যে যন্ত্রণায় ছটফট করিবে, রজনীতে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের অশ্রুজলে উপাধান যে ভিজিয়া যাইবে, একটু রাগিলে তা ত মনে থাকে না। যাকে ভালবাসি রাগে পড়িয়া তাকে কষ্ট দিয়া কত কষ্ট পাই। যাহাকে নিষ্ঠুর কথায় কাঁদাইয়াছি,তাহার অনুপ-স্থিতিতে দিবসে বা রজনীতে বিশ্রামের জন্য যখনই চক্ষু মুদ্রিত করি, অমনি তাহার অশ্রুসিক্ত আনন, স্নেহপ্রার্থী চক্ষু ও ভীতি-কম্পিত ওষ্ঠ মানসনেত্রে দেখিতে পাই—তখন অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তাহার পদতলে মাথা রাখিয়া কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা করে। এতবার যে অনুতাপে দগ্ধ হইলাম, তবু ত হৃদয় বিশুদ্ধ হইল না, তবু ত মালিন্য দুর হইল না, তবু ত ক্রোধের হাত এড়াইতে পারিলাম না। যাকে খুব ভালবাসি, যখন তার প্রতিই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি না, যখন আহত হইয়া তাহারও প্রাণে আঘাত না দিয়া ক্ষান্ত হই না,তখন যাহা-

দিগের তত বা মোটেই ভালবাসি না, তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ কিরূপে সম্বরণ করিব, তাহাদিগের উপর প্রতিহিংসার চেষ্টা কিরূপে নিবারণ করিব? ক্রোধ ও প্রতিহিংসা পশুর প্রবৃত্তি, সয়তানের ধর্ম্ম, নরকের পথ। আজি পর্য্যন্ত যদি প্রতিহিংসার দাস থাকিলাম তাহা হইলে আমার মনুষ্যত্ব কোথায়, শিক্ষার ফল কি হইল? তাহা হইলে ঈশার ও বুদ্ধের ও চৈতন্যের জীবন আমাকে কি শিখাইল? কেবল কথা, কেবল কথা!

প্রতিহিংসা একবারে করিবে না, রাগ এককালে করিবে না। এককালে করিবে না? হাঁ, এককালে না। রাগ ও প্রতিহিংসা সকল অবস্থাতেই পশুর প্রবৃত্তি, সকল মনুষ্যের পক্ষেই কলঙ্ক, সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অবমাননা, সকল সময়েই অবনতির প্রশস্ত রাজবর্ত্ম।

ইহার কি অর্থ এই যে, অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবে না, দুরাত্মাগণকে শাসন করিবে না, আত্মসম্মান রক্ষা করিবে না? ইহার কি অর্থ নিশ্চেষ্টতা? ইহার কি অর্থ অদৃষ্টবাদীর কার্য্যহীনতা? তাহা নহে। প্রতিহিংসা নিষিদ্ধ বটে, তাই বলিয়া প্রতিকার নিষিদ্ধ নহে। দস্যু তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে, তোমার স্ত্রী কন্যাকে অবমান করিবে, এমন অবস্থায় ও তুমি ক্রোধ করিবে না। প্রতিহিংসাকে মনে স্থান দিবে না,—কিন্তু দৃঢ়তার সহিত,সাহসের সহিত প্রতিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইবে—আবশ্যক হইলে প্রশান্ত ভাবে অবিচলিত চিত্তে শত সহস্র লোকের প্রণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য, ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, যদি কখনও কাহাকে কষ্ট দিতে হয়, এমন কি বধ

করিতে হয়, তাহাও করিবে—কিন্তু প্রতিহিংসার চরিতার্থে কাহাকেও লেশ মাত্র কষ্ট দিবে না।

মানুষের তিন অবস্থা আছে। প্রথমে যখন সে নিতান্ত অসভ্য ও অসংযত থাকে, তখন সে প্রতিহিংসা দ্বারা পশুবৎ চালিত হয়, তখন সে কষ্ট পাইলে কষ্ট-দাতাকে প্রতিদানে কষ্ট দিতে পারিলে সুখী হয়। দ্বিতীয় অবস্থাতে, কষ্ট পাইলে সে উৎপীড়ককে কষ্ট দিতে চাহে না, ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার যাহাতে কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, কেবলমাত্র তাহার জন্য চেষ্টা করে। ইহাকে আত্মরক্ষাগত প্রতিকার বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় ও সর্ব্বোচ্চ অবস্থাতে মানুষ যখন আরূঢ় হন, তখন তিনি নিজের কষ্টের প্রতি তত লক্ষ্য করেন না, কষ্টদাতার যাহাতে পাপ প্রবৃত্তি শমিত হয়, সে যাহাতে নৈতিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে, তাহার জন্য তখন তিনি চেষ্টা করেন। ইহাকে শত্রুশিক্ষাগত প্রতিকার বলা যাইতে পারে।

এই উচ্চ অবস্থাতে আসিয়া মানুষ পবিত্রতার রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন তাহার অন্তর হইতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি, ক্রোধ, রিপু, একবারে তিরোহিত হয়। প্রতিহিংসা তখন দয়াতে পরিণত হয়—তখন যুদ্ধ মানুষের সহিত নহে, তাহার পাপের সহিত। তখন চেষ্টা, শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্য নহে—তাহাকে উন্নত করিবার জন্য। তখন তিনি পাপাশয় শত্রুকে রোগীবৎ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকের ন্যায় তাহার রোগের প্রতীকার করিতে বসেন। শত্রু কর্ত্তৃক হননে ক্রুদ্ধ হন না, আত্মরক্ষার জন্যও ব্যস্ত হন না, রোগী কিসে আরোগ্য লাভ করিবে কেবলমাত্র সেই চিন্তাতে মগ্ন। তখন পবিত্র দয়া তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছলিত হইয়া,

শক্রকে স্নাত করিয়া, তাহার মালিন্য দূর করিবার জন্য মধুর কল কল রবে প্রবাহিত হয়। তখন তিনি নিজেকে বলিদান দেন, সকল কষ্ট, সকল ত্যাগস্বীকার, সর্ব্বজনের মঙ্গলের জন্য আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করেন।

তখন তিনি নরদেহে দেবতার জীবন লাভ করিয়া ঈশা, বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায়, কেবলমাত্র সংসারের মঙ্গলের তরে উচ্চতম প্রতি-কারের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য, প্রতিহিংসার অধর্ম্ম ধরাতলে লোপকরণের জন্য, সর্ব্বত্র বিরাজ করেন। তখন তিনি জীবনের জ্বলন্ত স্বর্গীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা এই মহাবাক্যের শিক্ষা দেন—যে প্রতিকার, প্রতিহিংসা নহে।

বিজ্ঞাপন।

অজি কালি কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভারি ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কতরকমেরই যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কত প্রকার দেশহিতৈষিতা তাহাতে যে প্রকটিত থাকে, কত প্রকার মনো-মোহিনী ভাষা তাহাতে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অন্ত নাই। ক্রেতা রূপ মৎস্য ধরিবার জন্য, সংবাদপত্র রূপ সরোবরে কত বিজ্ঞাপন দাতা, কত রকম চার ফেলিয়া ছিপ পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য পুকুরের মালিককে কিছু কিছু টাকা দিতে হয়। যে যত গুলি ছত্র স্বরূপ ছিপ ফেলিবে তাহাকে তত অধিক জমা দিতে হয়। অধিক ছিপ ফেলিলেই যে মাছ অধিক ধরা যায়, তাহা নহে। বিজ্ঞাপনের ভাষারূপ মাল মসলা দিয়া চার ও টোপ তৈয়ার করিতে হয়।

কোন কোন ব্যক্তির ভাষা-চারের এমনি খোসবু, যে তাহারা চার ফেলিতে ফেলিতে ভ্রান্ত মৎস্যগণ সুগন্ধে আমোদিত হইয়া পালে পালে আসিয়া টোপ গিলিয়া ফেলে এবং শেষে বড়ই পস্তা-ইতে থাকে।

সংসারে বিজ্ঞাপনটা যে কেবল সংবাদপত্রেই দেওয়া হয় তাহা নহে। আমার সময় সময় বোধ হয়, সংসারে যেন কোন না কোন আকারে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে, সংসারে যেন কেহই একটা না একটা বিজ্ঞাপন খাড়া না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে না। যেন চতুর্দ্দিকে "আমায় দেখ দেখ গো" "আমায় দেখ গো" এইরূপ বলিয়া সকলেই চীৎকার করি-তেছে। যেন আমাকে অন্য লোক না দেখিলে, অন্য লোকে আমার নাম না শুনিলে, আমার জীবন বৃথা যাইল—যেন সংসারে জীবনের একমাত্র এবং কেবলমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে প্রচার করা, আপনার নাম অন্যের কণ্ঠে নিনাদিত করা, আপনার কীর্ত্তিকলাপ অন্যের হৃদয়ে খোদিত করা। এইরূপ আত্মঘোষণাতে যে নীচতা আছে তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টি করিতে চাহে না।

প্রায় সকল মানুষই যেন বিজ্ঞাপন দিবার জন্য, আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য ব্যকুল। কেহ বহি লিখিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি কবি, কেহ বক্তৃতা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, আমি স্বদেশপ্রেমী; কেহ কথোপকথনে বা নিজের রচনাতে নানা প্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন, আমি পণ্ডিত; কেহ বা গাড়ি ঘোড়া হাঁকাইয়া, বিজ্ঞাপন দিতেছেন আমি ধনী; কেহ বা প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া স্তূপীকৃত ইষ্টক রাশি দ্বারা বিজ্ঞাপন দিতেছেন অমি লক্ষপতি। কেহ বা বিচিত্র

বেশে সাজিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন,—"আমি বেশ সাজিয়া আছি, তোমাদিগের পায় পড়ি আমাকে একবার দেখ গো।"

কেহ বা সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞাপন দিতেছে। যেন প্রতি পদ-বিক্ষেপে প্রতি কটাক্ষে বলিতেছে, "ওগো আমাকে দেখো গো, আমি দেখিতে বড় সুন্দর। তোমরা আমায় ভাল করিয়া না দেখিলে আমি প্রাণে বাঁচি না।"

সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি অনেকে এক একটা ভ্যাঁপু স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেখানে যাহা করেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে একবার তূরীধ্বনি করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন না দিয়া তাঁহারা শান্তি লাভ করিতে পারেন না। সভ্যতার সহিত সকল প্রকার বিজ্ঞাপনে আড়ম্বর, চটক ও নির্লজ্জতা দিন দিন বাড়িতেছে।

আমি যে একটা মস্ত লোক, আমার রচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থ যে একটা অপূর্ব্ব পদার্থ, আমার দোকানের জিনিস যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,দেখুন, এই কথা,সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া, বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দিয়া, কত লোকে অম্লানবদনে ফুকারিয়া বলিতেছে। সভ্য ইংলণ্ড ও সভ্য আমেরিকাতে এই জুয়াচুরি অধিক পরিমাণে বিকশিত হইতেছে। ভারত অন্ধ বিলাতের নিকট সভ্যতা শিখিতেছে, সুতরাং বিলাতের সভ্যতার জুয়াচুরিটুকুও বেশ শিখিতেছে।

লণ্ডনের পথ দিয়া চলিয়া যান, বিবিধ বর্ণে, বিবিধ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। একটী ছাতা-আওলার দোকানের বাহিরে লোহিত কাষ্ঠে লেখা রহিয়াছে, দেখিবেন—"যদি ছাতা কিনিয়া না ঠকিতে চান তাহা হইলে এই দোকানে ছাতা ক্রয় করুন।" ঐ দোকানের পাশেই আর একটী ছাতার দোকান

রহিয়াছে, তাহার বাহিরে নীল কাষ্ঠফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—"যদি আপনি যথার্থ ভাল ছাতা চান, তাহা হইলে সতর্ক হইবেন; তাহা কেবল আমার দোকানে পাইবেন।" প্রায় সকল মুদিরই দোকানে এই বিজ্ঞাপন দেখিবেন—"একবার আমারি দোকানের চা খাইলে আর কোনও দোকানের চা রুচিবে না।" কি নির্লজ্জ মিথ্যাবাদিতা! একটা অতি প্রকাণ্ড চার দোকান, লজ্জা ও সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন—"আমরা ডিউক, মার্কুইস বড় ওমরাও লোককে যে চা দিয়া থাকি, সেই চা ১॥০ টাকা পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় করিয়া থাকি" কি ভয়ানক প্রতারণা! বিলাতে বিজ্ঞাপনে অদ্ভুত টাকা খরচ করা হয়। বিলাতের প্রধান দৈনিক পত্র "টাইমসে" র ষাটি স্তম্ভ বিজ্ঞাপনে পূর্ণ। এমন অনেক দোকানদার আছে যাহারা ইংলণ্ডের প্রত্যেক সংবাদপত্রে, প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রত্যেক পুস্তকের মলাটে, প্রত্যেক সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। * এই বিজ্ঞাপন সমুদ্রে যে কত জুয়াচোর হাঙ্গর ডুব দিয়া রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। অসতর্ক পাঠক পাইলেই তাহারা তাহাদিগকে টপ করিয়া গিলিয়া ফেলে।

এইরূপ জুয়াচোর হাঙ্গর এ দেশের বিজ্ঞাপক দিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—ক্রমেই অধিক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষকে আঘাত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কাহারও নাম করিতে চাহি না। অনেক বিজ্ঞাপক আক্ষেপ করিয়া বলেন যে "কোন কাগজেই এখন বিজ্ঞাপনে আর বড় কাজ হয় না।" কেমন করিয়া হইবে? এত

---

* John Bull and His Island PP 58—59.

লোক মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে যে,ক্রেতাগণের বিজ্ঞাপন মাত্রেরই উপর একটা ঘোর অবিশ্বাস দাঁড়াইতেছে। কেহ, বিজ্ঞাপন দেখিয়া পয়সা পাঠাইয়া বহি পায় না; কেহ বহি পাইয়া দেখে, তাহা ছাই পাঁশ, অস্পৃশ্য ঘৃণিত ন্থক্কারবৎ; কেহ ঔষধ কিনিয়া দেখে তাহা—ডোবার রংকরা পাঁক। যারা কোন জন্মে ডাক্তারি শিখে নাই, তারাও নূতন ঔষধ অবিষ্কার করিতেছে, এবং তাহা সর্ব্ববিধ রোগের অব্যর্থ অমোঘ ঔষধ বলিয়া, অসঙ্কুচিত চিত্তে বিজ্ঞাপন ভেরীদ্বারা, ঘোষণা করিতেছে। কাজে কাজেই যাহারা সত্য বিজ্ঞাপন দিতেছেন, জুয়াচোরদিগের জন্য, তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনে আর তত কাজ হইতেছে না। এই সকল জুয়া-চোরদিগের যাহাতে দমন হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সত্য কথা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করায় অবশ্য কোন দোষ নাই, বরঞ্চ তাহাতে উপকার আছে। কত লোকে কত রোগে কত কষ্ট পাইতেছে। যদি কোন ঔষধে কোন রোগের যথার্থই প্রতী-কার হয়, তাহা প্রকাশ করিলে অনেকের উপকার হইতে পারে। খারাপ রোগের ঔষধ হইলেও তাহা প্রকাশ করা উচিত।

সংসারে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন দিয়া লোকে অর্থ উপা-র্জ্জন করে। মহানগরীর রাজবর্ত্মে বারাঙ্গনারা নিজের দেহ-রূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহা দ্বারা পথিকগণকে নরকে আকর্ষণ করিবার জন্য কতই চেষ্টা করে। * ইহারা বিজ্ঞাপনে কি বলিতেছে? "এস পথিক, তুমি আমাকে পয়সা দেও, আমি

* ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষিত পাঠকগণের মিলটনের Areopagitica তে বারাঙ্গনার কতকটা এবম্বিধ বর্ণনা স্মরণ হইবে।

তোমার নিকট আমার সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্ম বিক্রয় করিতেছি।" ঘৃণিততম—নীচতম এই সকল বিজ্ঞাপন। কত ঘৃণিততম, নীচতম এই সকল পাপীয়সীদিগের জীবন। কিন্তু সংবাদপত্রে যাহারা বারাঙ্গনাদিগের কটাক্ষবৎ মিথ্যাপূর্ণ চটুকে ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদিগের জীবন কি বারাঙ্গনাদিগের জীবনের ন্যায় ঘৃণিত নহে? প্রলোভন, প্রতারণা, ঘৃণিত বিজ্ঞাপন, উভয়েরই অস্ত্র,—অন্যের অর্থ অবৈধরূপে গ্রহণ করা, উভয়েরই উদ্দেশ্য—নরকে উভয়েরই বাসস্থান।

আমরা আর অসৎ বিজ্ঞাপনের আলোচনা করিতে পারিতেছি না। এখন সাধু বিজ্ঞাপনের আলোচনা করা যাউক। সংসারে যে যাহা করিতেছে, যে যাহা বলিতেছে, যে যাহা লিখিতেছে, তাহাতেই কোনও না কোন প্রকারে সত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিতেছে। বিজ্ঞানের বড় বড় পুস্তক, আবিষ্কৃত সত্যের বিজ্ঞাপন মাত্র। ভাল ভাল কবিতা, এক প্রকার সঙ্গীতময় সত্যের বিজ্ঞাপন। আর মধুর পবিত্র সঙ্গীত—স্বর্গ রাজ্যের বিজ্ঞাপন। আর ধর্ম্মকার্য্য, পরোপকার, দয়া, প্রেম—পবিত্র আত্মার অস্তিত্বের বিজ্ঞাপন। অজ্ঞান-আঁধারে লোকে দিশিহারা হইয়া পৃথিবীতে ফিরিতেছে। জ্ঞানী মহাজন যাঁহারা, তাঁহারা উন্নতির ঠিক পথ কোন্ দিকে তাহা দেখাইবার জন্য, সময়ের রাজবর্ত্মে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া বিজ্ঞাপন মারিয়া দিতেছেন, পুস্তকের খুঁটিতে "সাইন বোর্ড" টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারক যাঁহারা, স্বর্গ বা স্বর্গরাজ্যের পথ কোন্ দিকে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, দেশে দেশে বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

আর দেখুন, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং কত স্থানে, কত রকমে, কত বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে নীল কাগজের উপর, হীরকের অক্ষরে, প্রতিরাত্রিতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? আপনারা স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাই শুনিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, সমুদায় আকাশে, হীরক অক্ষরে কে বিজ্ঞাপন দিয়া রাখিয়াছেন। ঐ বিজ্ঞাপন কি প্রকাশ করিতেছে? অযুত বৃন্দ জগৎ—অনন্ত ব্যাপ্তি, অনন্তগতি, জ্যোতির্ম্ময়তা, সুনিয়ম—মধুর মহীয়ান্ বিশ্বব্যাপী গভীর সঙ্গীত। বলিহারি এই বিজ্ঞাপনের!! আকাশে কেন, জগতের যে দিকে চান, সে দিকেই বিজ্ঞাপন—সমুদায় সৃষ্টি বিজ্ঞাপন—জ্বলদক্ষরে অসংখ্য অসীম, অনন্ত, অবিনশ্বর, সত্য দিবানিশি প্রচার করিতেছে।

বাঁশী বাজরে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। বোধ হয় দুই প্রহর। পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নায় ধরাতল ভাসাইয়া দিয়াছে। যেমন বন্যার জলে চারিদিক্ ভাসিয়া গেলে, যে দিকে তাকাই সেই দিকে জল থৈ থৈ করিতেছে দেখিতে পাই, তেমনি সেই রাত্রিতে যে দিকে তাকাই সেই দিকেই জ্যোৎস্না থৈ থৈ করিতেছিল। সেই জোৎস্নার বন্যাতে মাঠ ডুবিয়া গিয়াছিল, ফুলগাছ ও বড় বড় গাছ সব ডুবিয়া গিয়াছিল। আমি একক দ্বিতল গৃহে শুইয়া

মুক্ত বাতায়নপথে সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাপ্লাবন, মৃদু মারুতহিল্লোলে সেই কৌমুদীতরঙ্গলীলা অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম। এমন সময় সুদূরে বংশীধ্বনি শুনিলাম—আকাশ কাঁপাইয়া—কানন কাঁপাইয়া—আমাকে কাঁপাইয়া, মধুর তীব্রস্বরে প্রাণ অস্থির করিয়া, বাঁশী বাজিতে লাগিল—বাঁশী উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বরে বাজিতে লাগিল। সেই বংশীধ্বনি "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" টোরি রাগিণী অপেক্ষা মিষ্ট, প্রান্তরে মন্দিরাভিমুখী বিমলার সঙ্গীতের অপেক্ষা মিষ্ট, জঙ্গফ্রগিরিতে ম্যানফ্রেড-শ্রুত বংশীধ্বনি অপেক্ষা মধুর—যমুনাতীরে বসন্তসমীরে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি অপেক্ষা অধিকতর মধুর লাগিয়াছিল। সেই বাঁশী শুনিতে শুনিতে সুখে প্রাণ ছটফট (?) করিতে লাগিল।—এ বাঁশী বাজায় কে রে? দুই প্রহর রাত্রিতে শ্রবণদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়ঘরে কার বাঁশীর সুর 'ট্রেসপাস' করিতেছে? এই বাঁশী বৃন্দাবনে গোপিকাগণের হৃদয়ে 'ট্রেসপাস' করিয়াছিল, এই বাঁশী রাধিকাকেও কলঙ্কিনী করিয়াছিল। বাঁশীর কি ক্ষমতা রে! ছয়টী টিপ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে কত কাণ্ডকারখানা হইয়া যায় রে! কিন্তু এই বাঁশের বাঁশী অপেক্ষা আর একটা গুরুতর বাঁশী আছে, ইংরাজি ফ্লুটের মত তাহার উপরে নীচে, আসে পাশে, অনেক টিপ; তাহা যে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সংসারে সে এক জন বড় লোক—তাহার প্রসার সর্ব্বত্র। এই বাঁশী মনুষ্য হৃদয়। রাজকুমার হাম্‌-লেটের মনের অবস্থা জানিবার জন্য, তাঁহার মনের গূঢ় কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার নিকট দুই বয়স্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বয়স্যদ্বয় রাজকুমারের মনের ভাব

কৌশলে কথায় কথায় বাহির করিয়া লইবার জন্য চেষ্টায় ফিরিতে ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজকুমার তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের হস্তে সহসা একটী বাঁশী দিয়া বলিলেন,—"বাজাও"।

বয়স্য বলিলেন—"প্রভু, আমি বাজাইতে জানি না।"

রাজপুত্র।—আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি বাজাও।

বয়স্য। আমি সত্য সত্যই বাজাইতে জানি না।

রাজপুত্র। দোহাই তোমার, একবার বাজাও।

বয়স্য। আমি উহার একটা টিপও জানি না।

রাজপুত্র। মিথ্যা কওয়া যেমন সহজ, ইহা তেমনি সহজ; এই ছিদ্রগুলি আঙ্গুল দিয়া টিপ, মুখ দিয়া ফুৎকার দেও, দিব্য এখনি বাজিবে। দেখ, এইগুলি ইহার টিপ্।

বয়স্য। কিন্তু এই সকল টিপ হইতে আমি সুস্বর বাহির করিতে পারি না।

রাজপুত্র। * * তুমি এই বাঁশীটী বাজাইতে পার না। আর তুমি আমাকে বাজাইবে—আমার হৃদয়ের টিপগুলি কি তুমি এমনি শিখিয়াছ? বাঁশীর অপেক্ষাও কি আমাকে বাজান সহজ? না, তুমি আমাকে বাজাইতে পারিবে না, আমার হৃদয়ের রহস্য তুমি বাহির করিয়া লইতে পারিবে না।

কবি গুরু সেক্ষপিয়ার মানুষকে এখানে বাঁশী বলিয়াছেন। এই বাঁশীর টিপ আয়ত্ত করিতে না পারিলে বড় কবি হওয়া যায় না, বড় সংস্কারক হওয়া যায় না, বড় সেনাপতি হওয়া যায় না। এই বাঁশী বাজাইবার কাহারও স্বাভাবিক শক্তি আছে, কাহারও অনেক কষ্ট করিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক অভ্যাস করিয়া শিখিতে হয়। এ বাঁশী বাজান সাধনায় যিনি

সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যখন তখন অন্যের হৃদয় হইতে ইচ্ছামত সুর বাহির করিতে পারেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে লোকের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়া লইতে পারেন—ইংরাজ বাগ্মী চ্যাটামের ন্যায়, দেশীয় বাগ্মী কেশবের ন্যায়, শ্রোতাদিগের হৃদয় বংশীতে ইচ্ছামত মল্লার বা দীপক আদায় করিতে পারেন।

অন্যের বাঁশী বাজান দূরে থাকুক, অনেকে নিজের হৃদয় বাঁশীটীও কখন বাজাইতে পারেন না, তাহা হইতে কখন একটা সুস্বর, কখন একটা মহৎ কার্য্য বা মহৎ চিন্তা বাহির করিতে পারেন না। তাঁহাদের ফুঁতে তাঁহাদের হৃদয় বাঁশী বাজে না, কেবল সোঁসাঁ ফুঁ ফাঁ করে। এই সংসারে অনেকেই কেবল ফুঁ ফাঁ করিয়া অন্যকে জ্বালাতন করিয়া থাকেন। যখন সংসারে সকলেই নিজের বাঁশী হইতে সুস্বর বাহির করিতে পারিবে, যখন সকলের কার্য্য চিন্তা মহৎ ও পবিত্র হইবে, তখন সংসারে অযুত অযুত বংশী একতানে বাজিয়া উঠিবে, তখন প্রেমের ও জ্ঞানের ঐকতানিক সঙ্গীতে জগত আনন্দে কম্পিত হইবে। এই ঐকতানিক বেণু কবে বাজিবে! সংসার সুস্বরে কবে ভরিয়া যাইবে। আমার বাঁশী কবে বাজিবে? আমি এত করে বলি বাঁশী বাজরে, তবু ত বাঁশী বাজে না। বাঁশী কি চিরকালই নীরব থাকিবে, একটী গৎও বাজাইতে পারিবে না, একটী রাগিণীও আদায় করিতে পারিবে না, সংসারে একটী সুস্বর কার্য্য একটী সঙ্গীতময় চিন্তাও আনিতে পারিবে না?

আর ভারতের বাঁশী কবে বাজিবে, এখন যে চারিদিকে বড়ই বেসুরা শব্দ। কাণ ঝালাপালা হইল। আমি ভাবিতেছি, আমার বাঁশী বাজিতেছে না, ভারতের বাঁশী বাজিতেছে না,

জগতের বাঁশী বাজিতেছে না। কতবার বলি "বাঁশী বাজরে" তবু ত বাঁশী বাজে না। ভাই, বাঁশীর টিপ্ গুলি যত্ন করিয়া শিখিয়া লও।

শাদা বনাম কাল।

শাদা রঙ্‌টার কি গুণ আছে, আপনারা বলিতে পারেন? শাদা রঙ্‌টা ধাঁ করিয়া আমার চোখে কেমন লাগিয়া যায়। শাদা দেখিলে যত ভাল জিনিস, যত ভাল ভাব, যত ভাল কথা, মনে আইসে। কাল দেখিলে যত বিশ্রী জিনিস, যত খারাপ ভাব, যত মন্দ কথা, তাই মনে পড়ে। শাদাতে যেন পবিত্রতা, শাদাতে যেন আলোক, শাদাতে যেন সরলতা, শাদাতে যেন স্বাধীনতা, শাদাতে যেন মুক্তি বিরাজ করিতেছে। কালতে যেন পাপ, কালতে যেন অন্ধকার, যেন কপটতা, যেন অধীনতা, যেন সর্ব্বনাশ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। শাদা রজত পৌর্ণমাসী; কাল ঘোরা অমানিশি। শাদা আশাময় হাস্য, কাল নৈরাশ্যময় ক্রন্দন। শাদা—তুষারশুভ্র স্বাধীন ইংরাজ; কাল—কেশকৃষ্ণ অধীন বাঙ্গালী।

তাই ত, শাদার ত অনেক গুণ! তাইতে, বিবাহের জন্য যখন লোকে মেয়ে খুজে, কাল রং চাহে না, ফরসা মেয়ে চায়; মুখশ্রী বেশ থাকিলেও রং কাল হইলে, ঘটকের মুখ একটু মলিন হইয়া যায়, পাত্রের উৎসাহ একটু মন্দীভূত হইয়া পড়ে। আমি যখন মনে করি, কত মা কাল মেয়েকে সুন্দর করিবার জন্য দিন রাত্রি তাহাদিগকে ঘষিয়া মুছিয়া পুঁছিয়া থাকেন—কত কৃষ্ণা

যুবতী কত সাবান, কত তেঁতুল, কত বেসম খরচ করেন; কাল মুখকে ফরসা করিবার জন্য, লুকাইয়া লুকাইয়া কত জলের ভাব দেন—কত বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সাহেব ঈশ্বরের কাল ছাপ তুলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া কোমল মুখ খানিকে সাবান ও তোয়ালে দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কত লাঞ্ছিত করেন—যখন এই সব মনে হয়, তখন আমার হৃদয়ে অনুকম্পার উৎস খুলিয়া যায়,—তখন আমি দুঃখের সহিত বলি, "হে ঈশ্বর, তুমি কতক লোককে শাদা করিলে, কতক লোককে কাল করিলে কেন ? কাহাকেও বা নীহারস্নাত গোলাবদলবৎ, কাহাকেও বা ঘনীভূত কৃষ্ণমসীবৎ করিলে কেন ? কাহাকেও বা কনকচম্পকবৎ, কাহাকেও বা শুষ্ক গোময়বৎ করিলে কেন ? তোমার ন্যায়পর রাজ্যে বর্ণভেদের ব্যবস্থা হইল কেন, অসাম্যের বাহ্য নিদর্শন প্রকটিত দেখি কেন ?"

রং কাল হয় কেন, আপনারা কেহ বলিতে পারেন ? সাধারণতঃ লোকে বলে উত্তাপে রং কাল হয়। কিন্তু লিভিংষ্টোন (Livingstone) সাহেব বলেন, কেবলমাত্র উত্তাপে রং কাল হয় না; উত্তাপ এবং আর্দ্রতা উভয়ের সংযোগে রং কাল হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) ও তাতেই মত দিয়াছেন (১)। আমি অত সূক্ষ্ম কথা বুঝিনা। আমি বুঝি স্থূল, কাল রং ভাল নহে, শাদা রং ভাল। কৃষ্ণপুরুষগণ ও কৃষ্ণরমণীগণ যদি তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত থাকেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি কেবল বলিতে চাই যে, তাঁহাদিগের কৃষ্ণ মাধুরীর জন্য ঈশ্বর আমাকে চক্ষু দেন নাই।

(১) Spencer's Principles of Sociology V.I.p 25.

শাদা বনাম কাল।

আমি দেখিতেছি, এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই, কৃষ্ণ পাঠক আমার উপর রাগ করিতেছেন, কৃষ্ণপাঠিকাগণ আমাকে বর্ব্বর বলিয়া অভিসম্পাত করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের সান্ত্বনার জন্য একটী কথা বলিতেছি। আমি স্বয়ং কাল। সকল বাঙ্গালী ও ত সাহেবের সঙ্গে তুলনায় কাল। কিন্তু আমি আবার কালর মধ্যে কাল—বেশ কাল। তবে যাঁহারা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারা বলেন যে আমার বর্ণ কাল নহে, তাহা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু আমি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের, আর কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে বড় ধর্ত্তব্য প্রভেদ বুঝিতে পারি না। আমি দুই রং বুঝি—শাদা আর কাল; যে শাদা নহে, সে কাল। আমি "উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের" কল্পনায় আমাকে কখন আত্মপ্রতারিত হইতে দেই নাই। আমি অনেক দিন বুঝিয়াছি "কৃষ্ণ" (বর্ণ) কে "শ্যাম" (বর্ণ) করিলে, কৃষ্ণ উজ্জ্বল হয় না। কৃষ্ণ "উজ্জ্বল" হয় গুণে। আমি ভরসা করি, পাঠিকার মধ্যে কেহ "উজ্জ্বল" (শ্যামবর্ণ) ভ্রমে আত্মপ্রতারিত হইবেন না।

আসুন কাল পাঠক, আসুন কাল পাঠিকা, আমরা কাল বর্ণের জন্য আমাদিগকে সান্ত্বনা করি। দেখুন দ্রৌপদী কাল, কৃষ্ণ কাল, রামচন্দ্র কাল, কোকিল কাল, কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর কাল, গভীর জলধি কাল, প্রশান্ত নির্ম্মল আকাশ কাল। "কাল জগতের আল" সরল শৈশবের কথা অবশ্যই সত্য। কে বলে কালতে সৌন্দর্য্য নাই? কালতে যদি মাধুরী না থাকে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অত নরপতি শরসন্ধানে ব্যাকুল কেন? কালতে যদি সৌন্দর্য্য না থাকে, গোপবালাগণ, রাধিকা-প্রাণ কৃষ্ণে মুগ্ধ হইল কেন? কালতে যদি লালিত্য না থাকে,

তাহা হইলে শুভ্রা দেশদিমোনা শ্বেত প্রণয়ী ছাড়িয়া কৃষ্ণ ওথে-লোকে মোহিত হইল কেন? কালতে যদি সৌন্দর্য্য না থাকে, রামচন্দ্রের শ্যামলকান্তি কল্পনার নেত্রে সতত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিস্বরূপ প্রতীয়মান হয় কেন? কালতে যদি সুধাময়ী মাধুরী না থাকে, তবে রমণীনেত্রের কৃষ্ণ তারকার কটাক্ষ বিশ্ব-বিজয়ী কেন, বা কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ-কলাপ সর্ব্বজন নয়ন-রঞ্জন কেন? আমিত এখন দেখিতেছি কালই ভাল, শাদা কি ফ্যাক্‌ফেকে ছাই। ইহার পূর্ব্বে কি ভুলই করিতেছিলাম? কালতে গাম্ভীর্য্য; কালতে মহত্ব; শাদা হাল্কা, শাদা ছেপলা, শাদা অসার, শাদা অর্থহীন। শাদা কাগজে অর্থ থাকে না। শাদা কাগজে কাল দাগ, কাল অক্ষর থাকে বলিয়া, তাহার অত মান। ঐ কাল অক্ষরে কত মহত্ব, কত বুদ্ধি, কত ভাব, কত কবিত্ব।

সত্য, বর্ণ ত কিছুই নহে, ঈথারের প্রতিফলিত প্রকম্পন বিশেষ। গুণই সব, বর্ণ কিছু নহে, কেবল চোখের ধাঁধা, কেবল দুদিনকার চটক। এই ত চম্পক বর্ণের গুণ গান করিতে-ছিলাম, এই ত অরুণহসিত নলিনীর লোহিত রাগের মোহে ভুলিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন রাত্রিতে রাজবর্ত্মে, গ্যাসের আলোকে একটী ইহুদীরমণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখিলাম, কেমন গোলাব ফুলের মত রং টল্‌টল্‌ করিতেছিল,—কিন্তু যখন দেখিলাম, সে নিলর্জ্জ হইয়া হাসিয়া হাসিয়া ইতরের সহিত ইতর রহস্য করিতেছে, চোখে, মুখে, হাসিতে পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, তখন কই তার রং ত আর ভাল লাগিল না। এখনও তাহাকে মনে হইলে, তাহার রং ঘৃণিত কুৎসিত

বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই বলি, রং কিছুই নহে, গুণই সর্ব্বস্ব, গুণই বিশ্ব-বিজয়ী, গুণই মুক্তিদাতা।

এ গেল কালর তরফে বক্তৃতা। আবার শাদার তরফে বক্তৃতা শুনিবে কি? শুন।

তোমরা যাই বল, শাদা রংই আজ কাল পৃথিবীতে জয়ী, পৃথিবী শাসয়িতা। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে (১৬৮৩) শাদা জাতির কি অবস্থা ছিল, তাহা দেখুন। তখনও শাদা জাতি আসিয়াতে স্থান পায় নাই, কেবল মাত্র ভারতবর্ষের কিনারায় গোয়া ও নোর এইরূপ দুই এক স্থানে অনুগৃহীত হইয়া আশ্রয় পাইত। তখন আফ্রিকার সমুদয় ভাগ আফ্রিকার ছিল, তখন আফ্রিকার রণপোতাবলী ভূমধ্যসাগরে প্রতাপবান্। তখন কৃষ্ণজাতির প্রবাহ ইউরোপে ধাবমান, তুরস্কজাতি ভিয়েনার দ্বারে উপস্থিত। তখন সমগ্র মানবজাতির দুই আনা অংশও শ্বেতজাতি নহে। তখনও কৃষ্ণজাতির পরাক্রমে শ্বেতজাতি কথঞ্চিৎ ভীত।

তাহার একশত বৎসর পর (১৭৮৩ সালে) দেখুন। শ্বেত-জাতির সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি মাত্র, সমগ্র মানবজাতির তিন আনার কিছু কম। তখন তাহারা ভারত জয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমেরিকা অধিকার করিয়াছে; আসিয়ার উত্তর-ভাগ গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহারা অষ্ট্রেলিয়াতে বসতি করে নাই; এবং ইউরোপের পূর্ব্বভাগে এবং আসিয়ার পশ্চিমভাগে কৃষ্ণজাতির পদদলিত।

কিন্তু আর একশত বৎসর পর (১৮৮৪), অর্থাৎ বর্ত্তমান-কালে তাহার অবস্থা দেখুন। গিফিন সাহেব দেখাইয়াছেন, এখন ইউরোপে এবং অন্যত্র শ্বেতজাতির সংখ্যা ৪২ কোটি।

এই একশত বৎসরে শ্বেতজাতি তিন গুণ বাড়িয়াছে। এখন শ্বেতজাতি সমগ্র মানবজাতির সংখ্যার পাঁচ আনা অংশের অপেক্ষাও অধিক। তাহাদিগের বাহুবল ও বুদ্ধিবল উভয়ই ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন চীন * ব্যতীত, কোন বৃহৎ কৃষ্ণজাতি শ্বেতজাতির প্রভুত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এ কথা বলা যাইতে পারে না। এখন সমুদয় ইউরোপ প্রায় শ্বেতজাতির, কেবল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে তুরস্কগণ ভীত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এখন উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ড দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরস্থ দ্বীপ সকল, আসিয়ার উত্তরভাগ, মধ্য আসিয়ার দক্ষিণভাগ (ভারত ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি) এ সব শ্বেত জাতির। আর আফ্রিকা ও দিন দিন শ্বেতজাতির করতলস্থ হইতেছে। হে জননি বসুধে! তোমার শ্বেত সন্তানগণ, তোমার কৃষ্ণসন্তানগণকে সভ্য করিবার ছলে, তাহাদিগের সম্পত্তি উপভোগ করিবার নিমিত্ত, তাহাদিগকে নাশ করিতেছে, তথাপি তোমার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে না কেন, তথাপি ভ্রাতৃহন্তা সন্তানগণকে শাসন করিতেছ না কেন?

কৃষ্ণজাতির পতন, বিনাশ, অপমান, লাঞ্ছনা মনে করিলে হৃদয় শোকে আকুল হয়। কিন্তু আশা কি নাই? কৃষ্ণ তাতারগণ এক দিন কি শ্বেত ইউরোপীয়গণকে পদদলিত করে নাই? কৃষ্ণ আরবগণ কি এক দিন শ্বেতজাতিগণকে পরাস্ত করে নাই? এক দিন শ্বেত ওষ্ঠ কৃষ্ণপদ কি চুম্বন করে নাই? তবে কেন আশাহীন হইব? তবে কেন এই মোকদ্দমাতে হা'র মানিব?

* অধুনা জাপান।

সামাজিক জোয়ার ভাটা।

আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভের পর কয়েক বৎসর সমাজের রীতি নীতির বড়ই পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা ইংরেজি, তাহাই প্রিয় ও গ্রহণীয় বোধ হইয়াছিল। এক সময় মদ, কুকড়া ও গরু খাওয়া সুশিক্ষার একটী অংশ, কুসংস্কার বর্জ্জনের একটি প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন অনেকে যেন ভাবিতেন, ভগীরথ যেমন সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণসলিলা জাহ্নবীকে আনিয়া সগরবংশকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তেমনি ইংরেজি শিক্ষা, পরিবর্ত্তনের স্রোতস্বতীকে সঙ্গে আনিয়া, বাঙ্গালী বংশের উদ্ধারের জন্য এই দেশে আগমন করিয়াছেন।

সেই সময়, শিক্ষিত যুবকগণ প্রাচীন হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিবার জন্য ব্যস্ত। তখন পরিবর্ত্তনের কোটাল বান ডাকিয়া আসিয়াছিল, এখন কিন্তু ভাটা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সংসারে কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি টেকে না। যত জোরে ঘাত, তত জোরে প্রতিঘাত হয়। ইতিহাসে নিয়তই এইরূপ হইতেছে দেখা যায়। প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে, রোমে এইরূপ পরিবর্ত্তন, এইরূপ অন্য জাতির অনুবর্ত্তিতা দৃষ্ট হইয়াছিল। এখন যেমন দেশানুরাগী সুরেন্দ্র বাবু ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, প্রজাসহায় টাইবীরিয়স্ গ্রাকাস্ ও (Tiberius Gracchus) রোডস্ (Rhodes) দ্বীপে তেমনি গ্রীক ভাষাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রথম ইতিহাস যেমন ডাক্তার মিত্র কর্ত্তৃক ইংরাজিতে রচিত হইয়াছে, রোমের প্রথম ইতিহাসও পিকতর (Fabius Pictor) কর্ত্তৃক গ্রীক ভাষায় রচিত হইয়া

ছিল। এখন আমরা বাঙ্গালা রচনায় যেমন ইংরাজির 'ফোড়ন' দেই, অষ্টাদশ শতাব্দীর জর্ম্মন লেখকগণ তাঁহাদিগের রচনায় মধ্যে মধ্যে যেমন ফরাসি ভাষা ব্যবহার করিতেন, তেমনি কোন কোন রোমক গ্রন্থকারদিগের রচনা মধ্যে গ্রীক শব্দ প্রয়োগ বিলক্ষণ দেখা যায়। এখানে এখন দেশীয় লোকের মধ্যে লেখাতে ও কথাতে, ইংরাজি যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, ইংলণ্ডে এখন যে পরিমাণে ফরাসির চলন আছে, রোমে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে গ্রীকভাষা ব্যবহৃত হইত। যেমন ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাস গিয়াছিল, রোমেও তদ্রূপ গ্রীক গ্রন্থ পাঠ করিয়া রোমক যুবকগণ প্রতিমাপূজা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর বলেন, কেটো (Cato) রোমক বাবুদিগের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আধুনিক বাঙ্গালী বাবুদিগের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক শিক্ষাতে স্বাধীন রোমক যুবাদিগের লাভ ও ক্ষতি উভয়ই হইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষাতেও বাঙ্গালীদিগের ক্ষতি ও লাভ উভয়ই হইয়াছে।

সে যাহা হউক, রোমে পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা যখন সপ্তমে উঠিল, তখন তাহা আবার নামিতে লাগিল। ঘাতের পর প্রতিঘাত ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হইল। তাই, কিয়ৎকাল পরে সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট অগষ্টসের (Augustus) সময়ে, রোমে পরিবর্ত্তনশীলতার বা গতিশীলতার স্থানে স্থিতিশীলতার আবির্ভাব হইল। যেমন পূর্ব্বে পরিবর্ত্তনশীলতার বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, এখন আবার তেমনি স্থিতিশীলতার বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যাহাই গ্রীসদেশীয়, যাহাই নূতন—রোম তাহাই গ্রহণ করিয়া-

ছিল, এখন আবার রোম, যাহাই রোমীয়,যাহাই প্রাচীন, তাঁহাই রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইল। এমন কি, এখন রীতি, সাহিত্য ও ধর্ম্মে যাহা কিছু নূতন, রোম তাহারই প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল, এবং যাহা কিছু প্রাচীন, তাহারই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই সময়ের প্রধান কবি বর্জ্জিল এবং প্রধান ঐতিহাসিক লিভিতে ঐ দোষ কতক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এখন যেমন কেহ কেহ বলেন,হিন্দুধর্ম্মের বলে হিন্দুদিগের উন্নতি হইয়াছিল,তেমনি বর্জ্জিল এবং লিভি উভয়েরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,রোমীয় পৌত্তলিকতাই রোমের উন্নতির কারণ। এখন যেমন বঙ্কিমবাবু ইংরাজি সাহিত্যের অনুরাগী উন্নতিশীল ও স্বাধীনচিন্তানুসারী হইয়াও কখন কখন স্থিতিশীল ব্যক্তিদিগের কার্য্যে যোগ দেন,হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রয়াসী হন, কবি হোরেসও (Horace) তেমনি কখন কখন রোমের প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহায়তা বা প্রশংসা করিতেন।

রোমে ধর্ম্ম ও সাহিত্যে যেমন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডেও তেমনি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া তিন বার ঘটিয়াছিল। তাহার মধ্যে এখানে আমরা কেবল একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করিব। প্রথম চার্লসের সময় ইংরাজ জাতির মধ্যে ধর্ম্ম ব্যবহারে ও সাহিত্যে অতিবিশুদ্ধতার (Puritanism) চরম হইয়াছিল। সুতরাং কিয়ৎকাল পরেই এই ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে অতিমালিন্য ইংলণ্ডকে কলঙ্কিত করিয়াছিল।

যে জোরে ঘাত বা ক্রিয়া হয়, সেই জোরে প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা আমরা রোমক ও ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে কতকটা দেখাইলাম।

আমাদিগের দেশে একটী ঘাত হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার প্রতিঘাত সময়ের আরম্ভ হইয়াছে। যেমন একদিকে পরিবর্ত্তনের বাড়াবাড়ী হইয়া গিয়াছে, তেমনি আবার অন্যদিকে অপরিবর্ত্তনের বাড়াবাড়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে। যেমন একদিকে হিন্দুধর্ম্ম ও প্রাচীনপ্রথা বিনাশের অতিরিক্ত চেষ্টা হইয়াছিল, তেমনি আবার অন্যদিকে হিন্দুধর্ম্ম ও প্রাচীন প্রথাগুলি রক্ষণের জন্য এখন অতিরিক্ত চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্বে জোয়ারের মুখে পড়িয়া অনেক নৌকা উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছিল, কোথাকার নৌকা কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল! এখনও আবার ভাটার টানে যে সকল নৌকায় যুক্তির শক্ত বন্ধন নাই, হুঁসিয়ার মাঝি নাই, তাহারা নিম্ন দিকে হুহু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকে এই ভাটায় নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদিগকে সভ্যতা ও উন্নতির সাগরে লইয়া যাইবে। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা জোয়ার ভাটার ক্রীড়ার সামগ্রী নহেন। আমরা দেশীয় রীতিনীতির বিরোধী নহি। যাহাতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মহাকীর্ত্তির স্মৃতি সংশ্লিষ্ট আছে, দীপ্তিময়ী প্রতিভার বা উজ্জ্বল গৌরবের সংশ্রব আছে, তাহা আমাদিগের বড় আদরের ধন, বড় ভক্তির ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। কিন্তু যে প্রথা অবস্থার পরিবর্ত্তনে, অথবা অন্য কারণে জাতীয় উন্নতির শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি আমাদিগের বিন্দুমাত্র মমতা নাই। অন্ধ অনুকরণ, মূঢ় পরিবর্ত্তন নিতান্ত হেয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে দিব না, তাই বলিয়া কি ভবিষ্যতের অসীম উন্নতির আশা ছাড়িয়া দিয়া, অত্যল্প যে টুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাই কোলে করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব?

ভূত ও বর্ত্তমান কাল, ভবিষ্যতের দ্বারা নিয়ত সংশোধিত, বা অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনের দ্বারা বারম্বার পরীক্ষিত না হইলে, মানবজাতি কখন উন্নতি সম্পাদন করিতে পারে না।

মূর্খতার রমণীয়তা।

আজি কালিকার দিনে যাঁহারা স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে দুইটা মজার কথা বলিয়া লোক হাসাতে পারেন, তাঁহাদিগেরই জিত। স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার উল্লেখ হইলেই স্ত্রীলোকে চাকরি করিবে এবং পুরুষে রন্ধন করিবে, স্ত্রীলোকে কাছারী যাইবে এবং সন্তানকে স্তন্য পান করাইবে ইত্যাদি নিতান্ত অসার ও ব্যঙ্গময় কথা বলিয়া, অনেক স্ত্রী-মূর্খতা-প্রিয় রসিক পুরুষ হাসির তুফান তুলিয়া দিয়া, যুক্তি ও বিবেচনাকে রঙ্গরসে ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। আজিও পুরুষদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক মূর্খ। তাহারা যে টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছে তাহা অর্থোপার্জ্জনের জন্য—মনের উন্নতি, হৃদয়ের উৎকর্ষ বা আত্মার বিকাশের জন্য নহে। উদরের দায়ে তাহারা মা সরস্বতীর শরণাগত হইয়াছে। বিনা শিক্ষায় অন্ন যুটিলে, তাহারা যে টুকু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহাও তাহারা শিখিত কি না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের যখন চাকুরি করিতে হইবে না, অন্নের সংস্থান করিতে হইবে না, তখন তাহাদিগের যে লেখা পড়া শেখা আবশ্যক, তাহা এই সকল নামে-মাত্র-শিক্ষিত বাস্তবিক মূর্খ পুরুষগণ কোন

রূপেই মনে ধারণা করিতে পারেন না। জ্ঞান যে কেবল উদরের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য নহে, কেবল মাত্র শরীরকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য নহে—তাহার যে মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, তাহাতে যে মনের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া মনকে পরিপুষ্ট করিতে হয়—এবং শিক্ষালাভ না হইলে, জ্ঞানলাভ না করিলে, মন যে দিন দিন শীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, বিবিধ ভ্রম ও কুসংস্কার ব্যাধি যে তাহাকে পীড়িত করে, বিশাল বিশ্বে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকূপে মন যে আবদ্ধ হয়—এই সকল অতি সহজ কথা উদর-শিক্ষিত লোক বুঝিতে পারেন না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন তাঁহারা কোন মতে অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা লজ্জায় মুখে যাহা বলুন, স্ত্রীশিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা যে একটা অনর্থক হাঙ্গাম, একটা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বিপ্লব, ইহা তাঁহাদিগের অন্তরের ধ্রুব বিশ্বাস। সেই নিমিত্ত যখনি কোন মূঢ় ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ভাঁড়ামি করিতে আরম্ভ করে, পবিত্র ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অঙ্গে নিজের অশ্লীল ও দুর্নীত ব্যঙ্গ ও কল্পনার কালিমা ঢালিতে প্রয়াসী হয়, তখন এই সকল মূর্খ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া, যুক্তির বিরুদ্ধে ভাঁড়ামির পোষকতা করিয়া, বাজি মাত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকদিগের, সমাজ-সংস্কারকদিগের কিছুমাত্র হতাশ বা দুঃখিত হইবার কারণ নাই। কি ধর্ম্মে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনৈতিক বিষয়ে, কি বিজ্ঞানে, জগতে কোন বিষয়েই কোন সংস্কার হয় নাই, যাহা অজ্ঞান ও অবিবেচক লোকগণ উপহাস করে নাই, অথবা অনেকে যাহাতে, বাধা দেয় নাই। এই সকল

উপহাস ধীর সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে হইবে, এই সকল বাধা অটল দৃঢ়তার সহিত অতিক্রম করিতে হইবে, এবং বিঘ্নকারিগণকে অনুকম্পার পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহাতে তাহাদিগের অন্ধচক্ষু ফুটে, যাহাতে যুক্তির ও জ্ঞানের প্রতাপ তাহাদিগের উপর বিস্তৃত হয়, তাহার জন্য অধ্যবসায়ের সহিত সতত চেষ্টা করিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম শত্রু পুরুষের ভ্রম ও মূর্খতা। স্ত্রীশিক্ষার দ্বিতীয় ও প্রবলতর শত্রু পুরুষের স্বার্থপরতা। এ কথা সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হণ্টার সাহেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিলে, তাহারা পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী থাকিবে না, কেবল মাত্র পুরুষ-সেবায় তাহারা আর রত থাকিবে না, অনেক স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী পুরুষের এই ভয়। কোন গুণ থাকুক, আর না থাকুক, এখন বিনা আয়াসে প্রায় প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ততঃ একজনের, অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর উপর আধিপত্য করিতেছে, যে নির্গুণ ব্যক্তি সংসারে কুত্রাপি কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে পায় না, যাহাকে কেহ ভয় করে না, সে গৃহে আসিয়া অন্ততঃ একজনের উপর (নিজের স্ত্রীর উপর) প্রভুত্ব করিতে পায়, অন্ততঃ এক জনকে নিজের ইচ্ছামত শাসন করিতে পারে, অন্ততঃ একজনের নিকট আপনার বিপুল মহিমা প্রচার করিতে পারে—এই বিনাশ্রমলব্ধ প্রভুত্ব মনুষ্য-হৃদয়, প্রাণ ধরিয়া কি সহজে ছাড়িতে পারে? একটী গল্প মনে পড়িল। এক দিন একজন শিখ বীর-বালা তাহার কাপুরুষ স্বামীকে ধিক্কার দিতেছিলেন। শিখ পুরুষ কোপে প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন, "আও, পঞ্জা লড়েংগে।"

যে কোন খানে মুখ পাইল না, সেও তাহার স্ত্রীকে পশ্চাতে হারাইয়া আপনার ধিক্কৃত অশান্ত মনকে প্রবোধ দিতে পারে।

এই সকল কারণে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা অনেকের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া, দুই একজন মহিলা যে উপাধি লাভ করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করা আবশ্যক এই বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, পুরুষেরা যে সকল পুস্তক পাঠ করে, তাহা পাঠ করিলে স্ত্রীলোকের রমণীয়তা, হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারে কোন কাজে লাগিবে না। ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, যে সকল পুরুষগণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, বা উকীল, বা কেরাণী হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হামিণ্টনের বা বেনের দর্শন শাস্ত্র, সেক্ষপীয়ার বা মিল্টন, শেলী বা ওয়ার্ড-সোয়ার্থের কবিতা, গ্যানো বা ডেশ্যানেলের প্রকৃতি বিজ্ঞান, ম্যাক্সোয়েলের উত্তাপ বিবৃতি, সংস্কৃত রঘুবংশ বা কাদম্বরী, মেনের এবং গডফ্রের জ্যোতিষ অধ্যয়ন করা কি আবশ্যক? কই, এই সকল পুস্তক চাকুরিতে তত কাজে লাগে না, তথাপি পুরুষদিগকে এই সকল বিষয়, সকল দেশেই কেন শিখাইবার চেষ্টা করা হয়? তাহার উত্তর—শিক্ষা কেবল চাকুরি বা অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য নহে—মনুষ্যের শরীর ও মনের পূর্ণবিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পুরুষের পক্ষে শিক্ষার দুই

প্রকার প্রয়োজন আছে। (১) প্রত্যেককে তাহার ভাবী অবস্থা ও ব্যবসায়ের উপযোগী করা। (২) প্রত্যেকের মন উন্নত ও পরিপুষ্ট করা। প্রথমটি "টেক্‌নিকাল" বা বিশেষ শিক্ষা, দ্বিতীয়টী "লিবারেল" বা উদারশিক্ষা। প্রথমটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আবশুক; দ্বিতীয়টী সকলের পক্ষেই সমান ইচ্ছনীয়।

সকল পুরুষের পক্ষে বিশেষ বা অবস্থানুযায়ী এবং সাধারণ বা উদার শিক্ষা আবশ্যক। এই উদারশিক্ষার নাম উচ্চশিক্ষা। আজি যদি গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, বাঙ্গালীরা যে কাজ করে, তাহাতে অর্থাৎ ডেপুটীগিরি কেরাণীগিরি ইত্যাদি কাজে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই, সুতারাং উচ্চশিক্ষা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এককালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত লোকের মধ্যে কি হুলুস্থূল পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আপানারা কত চীৎকার করিবেন, কত আবেদন পত্র লিখিবেন, টাউনহলে বিরাট সভা করিবেন, তারযোগে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে দুঃখ সভার সংবাদ ছুটাছুটি করিবে, দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সিপাহিবিদ্রোহের ন্যায় একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে; জাতীয়হৃদয়ে নৈরাশ্যের ঘোর অনন্ত অমাবস্যা ঘনীভূত হইবে, এবং সেই অমানিশির অন্ধকার ভেদ করিয়া একটা হাহাকার উত্থিত হইবে। কেন? বলুন কেন? আমাদিগের যে চোখ মুখ ফুটিতেছে, তাহা কি উচ্চশিক্ষার জন্য নহে? আমাদিগের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত জড়তা ও আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা ও কুসংস্কার যে চলিয়া যাইতেছে, নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন আশা যে মনে দীপিত হইতেছে, জগতে স্থার একবার যাহাতে

হিন্দুগৌরব প্রচারিত হয়, আর একবার যাহাতে পূর্ব্বের অপেক্ষা মহত্তর ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহার জন্য হৃদয়ে যে বাসনা ও চেষ্টা হইতেছে, তাহা কি উচ্চশিক্ষাজনিত নহে? সাহেবেরা এত যে আমাদিগের মনে আঘাত দেন, অসহ্য দাম্ভিকতা ও অপমানের তপ্তলৌহশলাকা দিয়া হৃদয় যে বারম্বার দগ্ধ ও বিদ্ধ করেন, তথাপি তাঁহারা আমাদিগকে যে উচ্চশিক্ষা দিতেছেন, ইউরোপের দুই সহস্র বৎসরে সঞ্চিত, ধনভাণ্ডারের দ্বার আমাদিগের নিমিত্ত যে উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছেন, ইউরোপের নবীন উদ্যম, বিস্তৃত সাহিত্য, উন্নত বিজ্ঞান, সমুদ্রের অপর পার হইতে আমাদিগের নিকট যে আনিয়া দিতেছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা, পুরুষগণ, যাহা মনের বিকাশের নিমিত্ত এত মূল্যবান্ মনে করি, যাহা হইতে বঞ্চিত হইলে, আপনারা হাহাকার করি, তাহা হইতে নারীগণকে আমরা কেন বঞ্চিত করিব? অনেক দুষ্ট সাহেব যেমন মনে করে, উচ্চশিক্ষা পাইলে ভারতপুরুষগণ ক্রমে অবাধ্য অদম্য হইবে, এবং সেই নিমিত্ত তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা, আমরাও কি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সেইরূপ মনে করিব?

যেমন পুরুষের পক্ষে উচ্চশিক্ষা বা উদারশিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষা বা অবস্থানুযায়ীশিক্ষা উভয়ই আবশ্যক, তেমনি স্ত্রীলোকের পক্ষে উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষশিক্ষা উভয়ই আবশ্যক। সন্তানাদি পালন করিবার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, তাহা বিশেষশিক্ষার অন্তর্গত হউক। পুরুষমানুষ যেমন "টেক্‌নিকাল" শিক্ষা পান, স্ত্রীলোক সেইরূপ কতকগুলি বিষয়ে "টেক্‌নিকাল" শিক্ষা পাইবেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা যে পরিমাণে পুরুষের পক্ষে

ইচ্ছনীয়, সেই পরিমাণে নারীগণের পক্ষেও ইচ্ছনীয়। পুরুষগণ যে পরিমাণে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবেন, নারীগণ ঠিক ততদূর পারিবেন, তাহা বলিতেছি না। কেবল এই বলি, উচ্চ-শিক্ষাসম্বন্ধে নারীগণের অবাধ সুবিধা ও অধিকার থাকুক। আর এই বলি, নারীগণের জন্য উচ্চশিক্ষাকে উপযোগী করিবার ছলে, উচ্চশিক্ষার অঙ্গচ্ছেদন করিও না, বিকলাঙ্গ ও বিফলীকৃত করিও না।

কেহ কেহ বলেন, উচ্চশিক্ষা পাইলে, নারীগণের কোমলতা ও রমণীয়তা নষ্ট হইবে, কাহার কাহারও মতে তাহাদিগের চরি-ত্রের বিশুদ্ধতাও যাইবে। উচ্চশিক্ষা যে কোমলতার বা রমণীয়তার বা সচ্চরিত্রতার বিরোধী, এবং মূর্খতা কোমলতার বা রমণীয়তার বা সচ্চরিত্রতার অনুকূল, এ কথা আমি কোন মতেই বুঝিতে পারি না। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে, যে কোমলতা বা যে রমণীয়তা বা যে সচ্চরিত্রতা পূর্ণজ্ঞানের আলোক সহ্য করিতে পারে না, যাহা নিশাচরের ন্যায়, মূর্খতার অন্ধকারে বিচরণ করে, তাহা কখনই সাধু কোমলতা নহে, রক্ষণীয়া রমণীয়তা নহে, তাহা কখনই প্রকৃত সচ্চরিত্রতা নহে। জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক ; অন্ততঃ পরস্পরের বিরোধী নহে। অনেক লোকে জ্ঞানী হইয়াও অসাধু হয়, সত্য বটে। তেমনি অনেক লোকে নির্ম্মল জল-বায়ু সেবন করিয়াও অসুস্থ। তাই বলিয়া নির্ম্মল জল বায়ু সেবন করা তাহাদিগের অস্বাস্থ্যের কারণ ইহা বিবেচনা করিতে হইবে না। কেহ কেহ কলুষিত জল বায়ু ব্যবহার করিয়াও সুস্থ থাকিতে পারেন ; কিন্তু তাই বলিয়া অপরিষ্কার জলবায়ু স্বাস্থ্য জনক, ইহা স্থির করিতে হইবে না। এই সকল নিতান্ত

সহজ কথা। কিন্তু অধিকাংশ লোকের আজিও নারীশিক্ষার প্রতি এতই বিদ্বেষ যে, তাঁহারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক হইয়াও এই সকল স্বীকার করিতে চাহেন না।

বিলাতেও নারীগণের শিক্ষা অনেক দিন এই কোমলতাতে আবদ্ধ ছিল। তাহাতে বিষময় ফল ফলিয়াছে। বিলাতে অধিকাংশ মহিলাগণ যে "কোমল" শিক্ষা পান, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিলে শিক্ষার অবমাননা হয়। একটু নভেল পড়িতে, একটু পিয়ানো বাজান, একটু নাচা, একটু গান করা, কিরূপ স্বরে কথা কহিবে, কেমন করিয়া হাসিতে হইবে, তাহা শেখা—এই হইল শিক্ষা। এই শিক্ষাতে ভড়ং আছে, বস্তু নাই; গর্ব্ব আছে, বল নাই। এই শিক্ষাতে পুরুষের বিলাসিতা পরিতৃপ্ত হইলে হইতে পারে; কিন্তু মনুষ্যজন্মের বিশেষ সার্থকতা সম্পাদন করে, তাহা অমরা মনে করি না। যাহা হউক, এখন ইংলণ্ডে গ্লাড্‌ষ্টোন, ফসেট ইত্যাদি সারবান বহুদর্শী সচ্চরিত্র কতিপয় ন্যায়বান ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার সহায় হইয়াছেন। ইংলণ্ডেই যখন এখনও এত লোক উচ্চশিক্ষা বিরোধী, তখন আমাদিগের দেশে ত হইবারই কথা।

আমাদিগের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইউরোপে প্রতি ছয় জন স্ত্রীলোকের মধ্যে গড় পড়তায় ১ জন শিক্ষা পাইয়া থাকেন। ভারতে গড় পড়তায় প্রতি ৮৫৮ নারীর মধ্যে ১ জন মাত্র শিক্ষা পাইতেছেন। ভারতবর্ষে সমুদায় শিক্ষার নিমিত্ত (১৮৮১ – ১৮৮২ সালে) ১,৬১,১০২৮০ টাকা খরচ হয়, তাহার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার কেবল মাত্র ৮,৪৭,৯৪০ অর্থাৎ প্রায় ১৬১ লক্ষের মধ্যে ৮ লক্ষ টাকা মাত্র স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয় হয়। স্ত্রী-শিক্ষার আরও অনেক টাকা ব্যয় করা আবশ্যক। কেবল মাত্র টাকা ব্যয়

করিলেও সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। বাল্য-বিবাহ স্ত্রী-শিক্ষার পথে এক ভয়ানক বিঘ্ন। স্ত্রী-শিক্ষার পথে, নারীজাতির উন্নতির প্রতিকূলে, অজস্র বিঘ্ন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেশের দৃঢ়বদ্ধ কুসংস্কার তাহার বিরুদ্ধে, পুরুষের স্বার্থপরতা, তাহার বিরুদ্ধে।" মূর্খতার রমণীয়তা" তাহার বিরুদ্ধে।

চন্দ্রের জন্ম। *

গগণভূষণ তুমি জগজন মনোহারী।-
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারী॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া বাতবিধুনিত বৃক্ষপত্রে, তরঙ্গায়িত তটিনী-বক্ষে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, অকাতরে জ্যোৎস্না-রাশি ঢালিয়া দিতেছে। পৃথিবি! তুমি চন্দ্রালোকে প্রাণভরিয়া হাঁসিতেছ কেন? এত হর্ষোৎফুল্ল সচকিতনয়নে চাহিয়া আছ কেন? কৃতী সন্তানকে দেখিলে, স্নেহময়ী জননীর আনন্দোৎস যেমন উছলিয়া উঠে, জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রমাকে দেখিয়া পৃথিবীরও আনন্দ-নির্ঝর সেই রূপ শতধা উছলিয়া পড়িতেছে কেন?

পৃথিবী চন্দ্রের জননী। সূর্য্য চন্দ্রের জনক। পাঠক হাঁসিবেন না, আমি রহস্য করিতেছি না। সত্য সত্যই চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র সন্তান, তাই প্রাণাধিক প্রিয়। তাই পুত্রের ঐ বিধু-মুখ দেখিয়া মাতা বসুধা দেবী আনন্দে অধীরা হন; সুখে হৃদয়

* এই প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক মত আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

উচ্ছ্বসিত হয়, মুখে আর হাঁসি ধরে না। আজ প্রায় ৫০,০০০,০০০ বৎসর চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। তখনও তাহার গর্ভধারিণী পৃথিবীর যৌবন কাল। তখনও তাঁহার দেহে যুবতীর তরলতা ও তাপ অধিকপরিমাণে ছিল। তখন তাহার গঠন সুগোল। তখন তাহার উপর নদ নদী গিরিগহ্বর কিছুই ছিল না। তখন বার্দ্ধক্যের বন্ধুরতা ও কাঠিন্য কোথায় আবির্ভূত হয় নাই। তখন ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় জলরাশি নভোমণ্ডলে মেঘাকারে ভাসিতেছিল। তখন যৌবন তাপে পৃথিবীর বারি বাসনা-আকাশে বাষ্পভাবে উড্ডীন।

তখন ধরিত্রী শ্যামল দূর্ব্বাদল বসন পরিধান করেন নাই। তখন পল্লবিত তরুরাজি, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ, নানাবিধ জীব জন্তু কিছুই ছিল না। তখন পৃথিবী কেবল মাত্র, পতির সহবাস সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেন। চন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে নিঃসন্তান ধরা দিনমণির অদর্শনে আঁধার বিষাদে ডুবিয়া যাইতেন।

আমরা সে কালের কথা বলিতেছি। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু যে "সে কালের" অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে কালের কথা বলিতেছি না। যে সময় আর্য্যঋষিরা পঞ্চনদে ঋগ্বেদ উচ্চারণ করিতেন, বা হিমালয়ের সানুদেশে উচ্চৈঃস্বরে একতানে সাম গান করিতেন, আমরা সে কালেরও কথা বলিতেছি না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার তুলনায় মনুষ্য ও জীব জন্তুর সৃষ্টি কল্যকার কথা মাত্র।

সেই সে কালের, ৫০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে নিশানাথের জন্ম হইল, কল্পনা ও যুক্তির বলে যুগযুগান্তরের অন্ধকার ভেদ করিয়া এই রমণীয় ব্যাপার আমরা মানসনেত্রে একবার দেখিতে চেষ্টা পাইব।

কোনও বস্তু বেগে ঘুরাইলে তাহার অপেক্ষাকৃত আলগা অংশগুলি সহজে খসিয়া পড়ে। সেরূপ বেশি বেগে ঘুরাইতে পারিলে যে কোন বস্তু খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। যে বস্তু বেশি কঠিন, তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিতে বেশি বেগে ঘুরান আবশ্যক। গাড়ির চাকা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইতে মাটি ও কাদা খসিয়া পড়ে। কুম্ভকারের চক্র খুব বেশী বেগে ঘুরাইলে কর্দ্দম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু অল্প বেগে ঘুরাইলে পড়ে না।

অতএব আমরা যদি এরূপ ধরিয়া লই যে, পৃথিবী ৫০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে অতি প্রচণ্ড বেগে মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছিল, তাহা হইলে উপযুক্ত কোন কারণ ঘটিলে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান অর্দ্ধ তরল পৃথিবী হইতে যে একখণ্ড পদার্থ খসিয়া পড়িবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

এখন পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার মাত্র আবর্ত্তন করে, কিন্তু ৫০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ৩ ঘণ্টায় একবার, এবং ২৪ ঘণ্টায় আট বার ঘুরিত। এই বেগে ঘূর্ণায়মান অর্দ্ধতরল পৃথিবীর উপর সে সময় আবার সূর্য্যের আকর্ষণও বেশী কার্য্যকারী হইয়াছিল। সকলেই জানেন, এখন প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা হয়। কিন্তু যখন চন্দ্র ছিল না, তখন কেবল, সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা হইত। পৃথিবী তখন তিন ঘণ্টায় একবার ঘুরিত, সুতরাং জোয়ারও দেড় ঘণ্টা অন্তর আসিত, এবং পৃথিবীতে এক প্রকার তরঙ্গবৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণ রূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। সূর্য্যের আকর্ষণ বশতঃ ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে নির্দ্দিষ্ট দিকে, নির্দ্দিষ্ট

সময়ের ব্যবধানে এই আন্দোলন হইতে থাকাতে, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে অবশেষে ভুস্ করিয়া পৃথিবীর কুক্ষি হইতে প্রকাণ্ড এক পদার্থ খণ্ড খসিয়া পড়িল। সুতরাং আমরা দেখিলাম, পৃথিবীর গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে কমনীয় চন্দ্রমার জন্ম হইল। পৌরাণিক কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-প্রিয় ব্যক্তিগণ সমুদ্র মন্থনে চন্দ্রোৎপত্তির কথা, একটু চেষ্টা করিলে আমাদিগের এই বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দিতে পারেন।

কোনও সচল দ্রব্যের যে বেগ থাকে, তাহার উপরিস্থিত প্রত্যেক দ্রব্যেরও সেই বেগ থাকে। বেগবান্ অশ্বের যে গতি ও বেগ থাকে, অশ্বারোহীরও সেই বেগ থাকে। এই নিমিত্ত ঘোড়া ছুটিতে ছুটিতে যদি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ায়, অশ্বারোহী ধপ্ করিয়া ঘোড়ার মুখের দিকে পড়িয়া যান। সচল ট্রামগাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিতে কাহারও কাহারও যে খিভ্রাট হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। তাহার কারণ, শরীর গাড়ির গন্তব্য দিকে ধাবমান হইতে যায়, কিন্তু পা মাটিতে বাঁধিয়া যায়, সুতরাং গাড়ির গতির দিকে শরীর অবাধ্য হইয়া হেলিয়া পড়ে এবং অসাবধান আরোহী বেচারা রাস্তার মাঝে পড়িয়া পয়সা খরচ করিয়া হাস্যভাজন হয়। যে বেগের জন্য এই প্রকার আছাড় খাইতে হয়, চন্দ্র ও সেই বেগ হেতু দিবানিশি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে। কারণ, চন্দ্র পৃথিবীর এক বিভিন্ন অংশ মাত্র; সুতরাং ছেদন কালে পৃথিবীর যেরূপ বেগ ও গতি ছিল, ছিন্ন চন্দ্রের ও সেইরূপ বেগ ও গতি হইল। অথবা আপনি যদি ভাবুক হন, আপনি বলিতে পারেন, মাতৃ-ভক্ত চন্দ্র, মাতাকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া, আকাশ-সংসারে

বিচরণ করিতেছেন। সংসারে কয়জন পুত্র এইরূপ করে? তাই বলি, চন্দ্র বড়ই সুসন্তান। জননীর বিষাদ-রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-সুধাকিরণ ঢালিয়া দিবার জন্য কেমন সুহাস্য বদনে দেখা দেন। মার ও প্রাণ ঐ চাঁদ মুখ দেখিয়া জুড়াইয়া যায়, পতির অদর্শনজনিত আঁধার দূরে গিয়া জীবন আবার এক নূতন ভাবে আলোকিত হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ কেম্ব্রিজের প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা ফ্রান্সিস্ দারবিন (Fransis Darwin) এবং আয়র্লণ্ডের (Astronomer Royal) বেল (Bell) সাহেবের ব্যাখ্যার মতের কিয়দংশ কল্পনার বেশে প্রকাশিত হইল। কলিকাতা কলেজের দুই এক খানি পাঠ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ মাত্র যাঁহাদিগের অবলম্বন, তাঁহারা সহসা এইমত প্রমাদযুক্ত মনে করিতে পারেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে যাঁহাদিগের গভীর গবেষণা আছে, তাঁহাদিগের নিকট ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে।

প্রবন্ধ লেখা পাঠকের জন্য। যে প্রবন্ধ পাঠক পড়িবেন না, তাহা লেখা অনর্থক। তাই এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানকে উপন্যাসের বেশে উপস্থিত করা হইল। তাই বঙ্কিম বাবু সীতারামে বলিয়াছেন, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য প্রায়ই উপন্যাসাকারে লিখিত হয়।

নূতন সংবাদ পত্র বা সূর্য্যে লৌহ আছে।

আমি বলিয়াছি, সূর্য্যের ঔরসে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। * বলিয়াছি সূর্য্যের উত্তাপময়, অনুরাগে পৃথিবী জীবিত ও শোভিত। সূর্য্যদেব পৃথিবীকে যথার্থই বড় ভালবাসেন। তাহাকে সিক্ত করিয়া উর্ব্বরা শস্যশালিনী করিবার জন্য, বিবিধ কুসুম রত্নখচিত শ্যামল বসন পরাইয়া দিবার জন্য, সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে বারি তুলিয়া লইয়া ধরিত্রী শরীরে বর্ষণ করিয়া থাকেন; আবার বায়ু ও, সূর্য্যদেবের উত্তাপের আদেশে ও শাসনে, সেই বাষ্পীভূত বারি একস্থান হইতে অপর স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায়। দেখ, সূর্য্যদেব আকাশে কেবল বারি তুলিয়া ক্ষান্ত নহেন, তাহা চতুর্দ্দিকে যাহাতে বর্ষিত হয়, তাহার জন্য মরুতদিগকে সতত চালনা করিতেছেন। সূর্য্যদেব বড় ভাল। সূর্য্যদেব পৃথিবীর চক্ষু প্রাণ, পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের চক্ষু ও প্রাণ।—আমি সূর্য্যদেবকে বড় ভাল বাসি—না,ভালবাসি ঠিক কথা নহে; আমি সূর্য্যদেবকে বড় ভক্তি করি—এত প্রতাপ এত প্রভুত্ব, এত পবিত্রতা, এত জ্যোতি—আমি আমার দুর্ব্বল চক্ষু তুলিয়া প্রভাকরের সেই জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল মনের সাধে নিরীক্ষণ করিতে পারি না, অত জ্যোতি আমি সহ্য করিতে পারি না, একটু তাকাইলে চোকে ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়,চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি। যাঁহার প্রতাপ আমি মস্তক তুলিয়া সহ্য করিতে পারি না, তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারিনা, ভক্তি করিতে পারি।

---

* কাহারও কাহারও মতে—

তথাচ সূর্য্যদেবের সহিত একটু পরিচয় করিতে ইচ্ছা হয়। সূর্য্যদেব কি ধাতুর লোক তাহা বুঝিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সূর্য্য যে অনেক দূরে; তাঁহার সংবাদ লইব কেমন করিয়া? ৪৬, ৪৪২,৫০০ ক্রোশ দূরে যিনি, তাঁহার সংবাদ পাইব কেমন করিয়া? আকাশের পথে রেল নাই, তাড়িত তার নাই, ডাকঘরের কোনই বন্দোবস্ত নাই। তাই বলি, কে গিয়া আমাকে সংবাদ আনিয়া দিবে? সংবাদলিপি কি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই?

আছে।—এ সংবাদলিপি তোমার নিকট অনেক দিন প্রেরিত হইয়াছে। তুমি তাহা সাদা কাগজ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি মনোযোগ কর নাই। কিন্তু তাহা সাদা কাগজ নহে। তাহাতে লেখা আছে। যদি তুমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, আর যদি তোমার বর্ণ পরিচয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি দেখিবে, উহাতে অন্ততঃ একটা সংবাদ আছে। তুমি বলিবে ঐ সংবাদ লিপি কোথায়? আমি বলি, তোমার সম্মুখে প্রতিদিন তাহা তুমি দেখিতে পাও। তোমার সম্মুখে লিপি বিস্তৃত হইয়া জ্বল-জ্বল করিতেছে। তাহাতে জ্বলন্ত অক্ষরে, দীপ্তিময় রেখাতে, সংবাদ লিখিত রহিয়াছে। বিজ্ঞান-গুরুর নিকট যাঁহার বর্ণ-পরিচয় হইয়াছে, তিনি তাহা অনায়াসে পড়িতে পারেন।

এই সংবাদপত্র সূর্য্যের কিরণ। উহা সাদা কাগজ নহে, বিবিধ (ভাব) রাগে রঞ্জিত অনন্ত অর্থ (বা ইথর) তরঙ্গে উচ্ছ্বাসিত, যতই চক্ষু ফুটিবে, যতই বর্ণ পরিচয় পূর্ণ হইবে, ততই এই রঞ্জিত, তরঙ্গিত, দীপ্তিময় লিপি ভাল করিয়া পড়িতে পারিবে; সূর্য্যালোককে যতই ভাল রকম পরীক্ষা করিতে পারিবে, ততই সূর্য্যের গূঢ়তম রহস্য ভেদ করিতে পারিবে।

সূর্য্যের সাদা আলোকে অনেক রং আছে। বিনয়ীর মত তাহারা সাধারণতঃ আপনাদিগের গুণ অর্থাৎ বর্ণ লুকাইয়া রাখে, পরীক্ষাস্থলে আসিলে প্রকাশ পায়। ঝাড়ের ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে সূর্য্যের আলোকে যত রকম রং আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রকম রংএর গতি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সকল রকম লোক এক পথে যাইতে ভাল বাসে না। সকল রকম রংএর আলোও এক পথে যাইতে ভাল বাসে না; ভিন্ন ভিন্ন রং প্রতিভাশালী স্বাধীনচেতা ব্যক্তির ন্যায়, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করে। সুতরাং ত্রিকোণ কাচের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পতিত ও প্রতিফলিত হয়।

এখন, যে কোন কঠিন বা তরল পদার্থ (এবং কোন রূপ বাষ্প ও) প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত করিলে, তাহাতে সাদা আলো বাহির হয়। ঐ সাদা অলোক উপরিউক্ত রূপে ত্রিকোণ কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে,তাহাতে সকল বর্ণের কিরণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ সাদা আলো প্রথম কোন বাষ্পের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পরে কাচের মধ্য দিয়া আসিলে, তাহাতে সকল প্রকার রং দেখিতে পাওয়া যায় না—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বাষ্পের মধ্যদিয়া আসিলে, ভিন্ন ভিন্ন রংএর অভাব দৃষ্ট হয়; জল কিম্বা দস্তার বাষ্পের মধ্য দিয়া আসিলে যে সকল রংএর অভাব লক্ষিত হয়, লৌহ-বাষ্প ভেদ করিয়া আসিলে সে রং গুলির অভাব লক্ষিত হয় না—অন্য আর কতকগুলি রংএর অভাব দেখা যায়। সংক্ষেপে, সকল বর্ণের কিরণ যে কোনও পদার্থের বাষ্পের মধ্য দিয়া আসিতে পারেনা।—কতক গুলি রশ্মি অবাধে

চলিয়া যায়, আর কতক গুলি বাষ্পের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, বোধ করি বাষ্পময় দেশে আসিয়া ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়া পথি-মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বাষ্প, ভিন্ন ভিন্ন রংএর কিরণ গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপ বর্ণের কিরণ বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য কিরণ গুলিকে অবাধে নিজের শরীর ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে দেয়।

সাদা আলো লৌহ-বাষ্পের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলে, যে কয়টী রঙ্গের অভাব দেখা যায়, সূর্য্যের কিরণ উপরি উক্ত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ঠিক সেই একটী রঙ্গের অভাব দেখা যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সূর্য্যকিরণ লৌহ-বাষ্প মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেই লৌহবাষ্প সূর্য্যমণ্ডল ভিন্ন, পৃথিবী ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে, আর কোথায়ও আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ লৌহ দ্রব করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করিতে যে উত্তাপের প্রয়োজন, সেরূপ উত্তাপ সূর্য্য-মণ্ডল ভিন্ন, পৃথিবী ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে, আর কোন স্থানে থাকা সম্ভব নহে। অতএব, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, সূর্য্য-মণ্ডলে লৌহ আছে, অথবা লৌহের অনুরূপ কোন পদার্থ আছে।

এইরূপে, সূর্য্যমণ্ডলে কি আছে, সূর্য্য কি ধাতুর লোক, তাহা আমরা অনেকটা জানিতে পারি। কিন্তু ঐ সংবাদ কোথায় পাইলাম? সেই দীপ্তিময় সংবাদলিপিতে—যাহা সূর্য্যদেব প্রতিদিন প্রাতে, প্রাভাতিক সংবাদ-পত্রের ন্যায়, আমাদিগের দ্বারদেশে প্রেরণ করিয়া, অন্ধকার দূর করেন, সূর্য্যরশ্মিই সেই সংবাদ-লিপি। জগতের চতুর্দ্দিকই সংবাদ লিপিতে পরিপূর্ণ, কেবল

পড়িতে পারিবার ক্ষমতা আবশ্যক, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র লিখিত রহিয়াছে। এই সকল অক্ষর যে যত পড়িতে শিখিতেছে, সে তত নূতন সংবাদ প্রকাশ করিতেছে। এই সকল সংবাদ "বিহষ্টন বা কাপরদেব" গিরিগাত্র খোদিত লিপি অপেক্ষা আশ্চর্য্য, মূল্যবান ও মহত্তর। বিজ্ঞানের রলিনসন এবং প্রিন্সেপ গণ কত অধ্যবসায়ের সহিত ঐ সকল অক্ষর, পড়িতে শিখিয়া, সংসারে নিত্য নিত্য নূতন সংবাদ প্রচার করিতেছেন। এই সংবাদের নাম বিজ্ঞান। এই সংবাদপত্রের নাম বিশ্বজগৎ। ইহার সম্পাদক স্বয়ং ব্রহ্মা।

"হৃদয় লও হে।"

যথার্থই আমি মনে করিয়াছি, আমাকে আমি বেচিব। একটু একটু করিয়া বেচিতে আরম্ভও করিয়াছি। এখনও অনেক বেচিতে বাকী আছে। কতদিনে সমুদয় বেচিতে পারিব, তাহা জানি না। ভবের হাটে, বিশ্বসংসাররূপ বাজারে, আমাকে বেচিবার জন্য আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আগে বেচিবার জন্য তত ব্যস্ত ছিলাম না, এখন বড় ব্যস্ত হইয়াছি। হাটের বেলা এখন বোধ হইতেছে যেন ফুরাইয়া আসিতেছে, যাহা কিছু বেচিবার কিনিবার আছে, তাহা শীঘ্র বেচিয়া কিনিয়া লই।

ভবের হাটে সকলই আছে, সুবিধা করিয়া সওদা করিতে পারিলেই হইল, ভাল জিনিষ চিনিয়া লইতে পারিলেই হইল। আমি প্রথমে যখন হাটে আসিলাম, তখন ভাবিলাম "জিনিষ

ত হরেক রকম দেখিতেছি—কিন্তু কিনি কি দিয়া? আমি যে বড়ই কাঙ্গাল, এই সকল মহামূল্য রত্ন আমি কিরূপে ক্রয় করি? হা বিধাতঃ, যে হাটে আমার কিছুই ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই; সে হাটে আমাকে কেন পাঠাইলে। কেবল কি যন্ত্রণা দিবার জন্য? কেবল কি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিবার জন্য?"

একদিন হঠাৎ বোধ হইল, আমি হয় ত কাঙ্গাল নহি, আমার কিছু নাই সত্য,—কিন্তু আমি ত আছি,—আমাকে বেচিলে হয় না? আমার বিনিময়ে কি হাটে কিছুই মিলিবে না? আমাকে একবারে বেচিতে না পারি, একটু একটু করিয়া বেচিতে পারি। আমার ভগ্নাংশ বিনিময় করিয়া বিশ্বসংসারের কি কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও লাভ করিতে পারিব না?

প্রথম দিন আমার হৃদয়ের একটুকু বিক্রয় করিলাম, একটু ভালবাসা অন্যকে দিলাম। সেই ভালবাসার প্রতিদানে, সেই ভালবাসার বিনিময়ে যাহা পাইলাম, তাহাতে জ্ঞানচক্ষু একটু ফুটিল, তাহাতে মানুষ যে কেহই কাঙ্গাল নহে, তাহা বুঝিলাম। যে ক্রেতার কাছে আমি আমার হৃদয়ের কতকটা বিক্রয় করিয়াছিলাম, তিনি আমার হৃদয় আরও চাহিতে লাগিলেন,—খুব অধিক দামে তাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, একটু হৃদয়ের, একটু ভালবাসার বিনিময়ে, অনেক হৃদয় অনেক ভালবাসা দিলেন। তাহার সেই ভালবাসা পাইয়া পূর্ব্বে যে হৃদয় নীরস নিরানন্দ ছিল, তাহা যখন স্নেহসিক্ত, প্রফুল্ল হইল—মরুভূমে আস্তে আস্তে যেন নন্দনকানন ফুটিতে লাগিল, তমসাচ্ছন্ন আকাশ যেন অরুণকিরণে হাসিতে লাগিল। এই বিনিময়ে আমার মূলধন অনেক বাড়িয়া গেল, হৃদয়টা একটু প্রশস্ত হইল;

স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা কতকটা কমিয়া যাইল—আমি একটু সওদা-গিরিও করিতে শিখিলাম, আপনাকে বেচিয়া পরকে কিনিতে কতকটা শিখিলাম।

"আপনাকে বেচিয়া পরকে কেনা" এই কথাটীতে তোমরা কিছু নূতনত্ব বা মহত্ত্ব দেখিতে পাইতেছ? আমি পাইতেছি। কথাটা প্রকৃত পক্ষে নূতন হউক আর না হউক, সুন্দর তাহার সন্দেহ নাই। আর সুন্দর বস্তু নিত্যই নূতন। নহে কি? আমি ত যাহাকে সুন্দর দেখি, তাহার সৌন্দর্য্য আমার নিকট নিত্যই নূতন, আমার মনে নিত্যই সুন্দর ভাব উদ্বোধিত করে।

আমি কেবল আমার কতকটা বেচিতে পারিয়াছি, এখনও অনেক বিক্রয় করিতে বাকি রহিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডে ক্রয় করিবার অনেক জিনিষ রহিয়াছে। আমাকে বেচিয়া, আমার ভালবাসা, সহানুভূতি, বুদ্ধি, শ্রম, বেচিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রয় করিতে হইবে, হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে—নিজের প্রাণ দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ লাভ করিতে হইবে। কথাটা বুঝি বড়ই অস্পষ্ট হইয়া যাইল। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার অভিপ্রায় বুঝাইতে চেষ্টা করি। একজন একটা বাগান টাকা দিয়া ক্রয় করিল। টাকার বিনিময়ে সে বাগান পাইল। সে কিনিয়াছে বলিয়া বাগান তাহার যদি মনে করে, তাহা হইলে সে বাতুল। সংসারে কেবল টাকা দিয়া কিছুই ক্রয় করা যায় না। হৃদয় না দিলে প্রকৃত পক্ষে কিছুই ক্রয় করা যায় না, নিজের করিয়া সম্ভোগ করা যায় না। একজন টাকার বিনিময়ে বাগান বা পুস্তক ক্রয় করিল, হৃদয় দিয়া ক্রয় করিল না। আর একজন তাহা টাকা দিয়া ক্রয় করিল না, কিন্তু হৃদয় দিয়া ক্রয় করিল, বাগানের

শোভাতে, বা গ্রন্থের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। এখন জিজ্ঞাসা, এই দুইজনের মধ্যে বাগান ও গ্রন্থ প্রকৃত পক্ষে কাহার?

ধর, একজন সাধু পুরুষ—কল্য খাইবার তাঁহার সঙ্গতি নাই—তিনি পথের ভিখারী। কিন্তু তিনি নিজেকে বেচিয়াছেন, তাই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী—তাই তিনি ভিখারী হইয়াও অতুল সম্পদশালী—তাই তিনি নরপতির অসীম ধন জন মানের কামনা করেন না। দেবমন্দিরে, রাজপথে বা বৃক্ষতলে তিনি যেখানেই অবস্থিতি করেন—অক্ষয় ধনভাণ্ডার তাঁহার হৃদয়ে—মানব প্রেমে অন্তর প্লাবিত—প্রকৃতির পবিত্র সৌন্দর্য্যে হৃদয় নিয়ত সেবিত। তাই তিনি ভিখারী হইয়াও অমিত ধনশালী। •তাই একদিন কপিলবাস্তুতে সাধুর নিষ্কাম পরহিত-রত জীবনের প্রশান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া, রাজপুত্র গৌতম, মুগ্ধ হইয়া বিষয় বাসনার অসারতা, রাজবৈভবের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—এবং অবশেষে ভিখারী জীবন অবলম্বন করিয়া, অপরিমিত অবিনশ্বর ধনলাভ করিয়াছিলেন—আপনাকে বেচিয়া বিশ্বপ্রেম কিনিয়াছিলেন। তাই তিনি দেবতা। এই ভবের হাটে প্রায় সকলেই আপনাকে বিক্রয় করে। তবে কেহ আপনাকে বিক্রয় করিয়া নরক কেনে—জীবনব্যাপী অনুতাপ, মর্ম্মভেদী নৈরাশ্য, মানসিক ও শারীরিক মহাব্যাধি। বারাঙ্গনা এইরূপে আপনাকে পাপ-সয়তানের নিকট বিক্রয় করিয়া, আত্মার বাসের জন্য, পুরীষময় কৃমিময়, বৃশ্চিকময় নরক আবাস ক্রয় করে। সেইরূপ ক্রয় করার কথা আমি এখানে কহিতেছি না। আমি আমাকে বন্ধুত্বের নিকট, প্রেমের নিকট, পবিত্র সৌন্দর্য্যের নিকট,

বেচিতে চাহি। আমি আমাকে বেচিয়া ধর্ম্ম কিনিতে চাহি, সত্য কিনিতে চাহি—আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আমাকে তোমরা কেহ কিনিবে? আমার প্রাণ 'ড্যামেজ প্রাণ' নহে। ইহা লইলে কেহ ঠকিবে না। আমি 'ক্রেডিটে' বিক্রি করিতে রাজি আছি। তোমরা কেহ আমাকে কিনিবে? আইস আমার প্রিয়তম বন্ধু, তোমাতে আর আমাতে একটা 'ফার্ম' খুলি—তাহাতে আত্মা, পবিত্র ভালবাসা, সহানুভূতি, বিশ্বপ্রেম বেচিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রয় করিব। এই 'এক্সচেঞ্জ হাউসে' খরিদদারের অভাব হইবে না। ইহার জন্য বিজ্ঞাপনও আবশ্যক হইবে না। তুমি আমার 'পার্টনার' হও আর না হও, আমি—আমাকে বেচিব।

আমাকে বেচিব এই কথা বলিয়াছি। মনে হইতেছে, কথাটা হয়ত ঠিক বলিতে পারি নাই, ভাষার দোষে হৃদয়ের ভাব হয়ত ঠিক প্রকাশ পায় নাই। আমাকে বেচিব—বেচিব কেন? দান করিতে কি পারি না? আমি বলিয়াছি সমুদয় আমাকেই বেচিব। আমি কি আমার একটুকুও নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশও বিনামূল্যে প্রাণ ধরিয়া কাহাকেও দান করিতে পারি না?—আমি এতই নীচ হইয়াছি? সংসারে আসিয়া কেবল কি বেচাকেনা ব্যবসাদারি শিখিয়াছি? জীবনে কি একটুকুও দান করিতে শিখি নাই? কাহারও ভালবাসা পাইব বলিয়াই কি আমি তাহাকে ভালবাসা দিব? বিলাসিনী ভালবাসা বা টাকা পাইবে বলিয়া তাহার ঘৃণিত ভালবাসা বা সৌন্দর্য্য বা পাপ বিক্রয় করে। আমিও ভালবাসা বেচিব? না?—ভালবাসা বেচিব না—আমি আমাকে বেচিব না।

এক্ষণে বেচা মনে করিয়া যে ব্যবসার কত নীচাশয়তা, ক্ষুদ্রতা, ধূর্ত্ততা, মালিন্য, হৃদয়শূন্যতা এবং পাপের কথা মনে আসিতেছে। সংসারে এখন ব্যবসায় অর্থে অল্প দিয়া অধিক শ্রমের ফললাভ করা—আমার ১০০ একশত টাকার মাল দিয়া অন্যের নিকটে অন্ততঃ ১১০ একশত দশ টাকা লওয়া। সংসারের চলিত ব্যবসায়ে সকলেই অল্প দামের মাল অধিক দরে বিক্রয় করিতে চাহে। যখন দর কমায় ক্রেতার সুবিধার জন্য নহে—প্রতিযোগী বিক্রেতার অসুবিধা করণের জন্য—অন্যকে লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে লাভ করিবার জন্য। 'অণ্ডার সেল' (Undersell) করার অর্থ কি? ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার অর্থ কি? স্বার্থপরতা নিজের ইষ্ট এবং অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা নহে কি? প্রচলিত ব্যবসায় পদ্ধতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন—তাহার স্তরে স্তরে স্বার্থপরতা নহে কি? দেখ, ধনী অনবরত অল্প টাকায় শ্রমীকে অধিক খাটাইতে চেষ্টা করিতেছে; অন্যদিকে আবার শ্রমী অল্প খাটিয়া ধনীর নিকট অধিক পয়সা লইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যবসায় কত ফাঁকি কত জুলুম, তাহা একটি প্রবন্ধে লেখা যায় না। আজি কালি ব্যবসায়ের অর্থ, আপনাকে বাড়ান অন্যকে কমান। চায়না বাজার ও রাধাবাজার তাহার সাক্ষী "My things, Sir, very good, Sir His things, Sir, not good Sir"—রাধাবাজার কেন, বড় বড় সুশিক্ষিত সাহেবের দোকান দেখ, বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংবাদ পত্রের স্তম্ভ দেখ। প্রত্যেক ব্যবসায়ীই অন্যকে কমাইয়া আপনাকে বাড়াইয়া ভ্যাঁপু বাজাই-তেছে। চতুর্দ্দিকের এই ঘৃণিত তূরীনাদে, চারিদিকের এই ভঁত ফোঁ ভঁত ফোঁ শব্দে কাণ ঝালাপালা হইতেছে, মনুষ্যের

নীচতা উচ্চৈস্বরে শব্দিত হইতেছে। না, ব্যবসায়ে বড় নীচতা, বেচা কেনায় বড় ক্ষুদ্রতা। আমি প্রাণের ব্যবসায় করিতে চাহি না। আমি আমাকে বেচিতে চাহি না। আমি আমাকে দান করিব, আমি আমাকে বিলাইয়া দিব, তোমরা কেহ আমাকে নেবে গো? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আমার অনেকটা অন্য একজনকে দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমি কমিয়া যাই নাই, ব্যবহারে লোকসান হয় নাই, বরঞ্চ ব্যবহারে আমার একটু খোলতাই হইয়াছে, হৃদয় একটু প্রশস্ত হইয়াছে। বিদ্যা যেমন দানে ক্ষয় না পাইয়া বৃদ্ধি পায়, আমিও দেখিতেছি, আমি আমাকে দান করিয়া দরিদ্র না হইয়া ধনী হইতেছি। আমি প্রথমে আমাকে কিরূপে দান করিতে শিখিলাম, বলিব?

একদিন আমি আমার হৃদয় পর্ণকুটীরে বসিয়া আছি, বিষণ্ণ ভাবে, নীরস মনে, যেমন প্রতি দিন থাকিতাম। সহসা সেই কুটীরের প্রাঙ্গনে কে আসিয়া যেন চারিদিক্ আলোকিত করিলেন। আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইল, প্রথমে কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না। পরে বোধ হইল, তাঁহার শ্রীতে রাজার সৌভাগ্য আছে, ঋষির পবিত্রতা আছে; তিনি যে এই অধমকে ডাকিয়া কথা কহিবেন, আমি তাহা ভাবি নাই, ভাবিতে সাহস করি নাই। আমার আশা অতিক্রম করিয়া কোমল কলকণ্ঠে, বীণানিন্দিত স্বরে আমাকে বলিলেন—"আমি অতিথি ক্লান্ত পথিক, তৃষ্ণা পাইয়াছে, একটু জল পাই?" আমি কেমন গলিয়া যাইলাম। যে হৃদয়-কুটীরে কখন অতিথি সেবা করিনাই, যেখানে কাহারও বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দেই নাই, সেই হৃদয়ে যত্ন করিয়া

আসন পাতিয়া দিলাম, পূর্ণ কলস হইতে স্নিগ্ধ স্নেহ-বারি, প্রাণের একটু ভালবাসা তাঁহাকে, ঢালিয়া দিলাম। তিনি তাহা পান করিলেন, ধন্যবাদ দিলেন; দুই একটা কথা কহিয়া, আমার সেই নীরব কুটীরে যেন সঙ্গীত লহরী তুলিয়া দিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ কাননে যেন শোভার কুসুম ফুটাইয়া দিয়া, তাহার পার্শ্বে চিন্তার নির্ম্মল তটিনী প্রবাহিত করিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি প্রতিদানের আশা করিয়া তাঁহাকে স্নেহ দান করি নাই, তথাচ দান করিয়াছিলাম বলিয়াই অন্ত এত অধিক প্রতিদান পাইলাম। হিসাব করিয়া দিলে, কে আমার সেই এক গণ্ডূষ ভালবাসার বিনিময়ে অত অধিক প্রতিদান করিতেন। কোথায়, কবে, এক গণ্ডূষ বারিতে, এক গ্রাস স্নেহে হৃদয়কুঞ্জে ফুল ফুটিয়াছে, পাখী ডাকিয়াছে, নির্ঝর ঝরিয়াছে? নিঃস্বার্থ ভালবাসার রাজ্যে। সেখানকার নিয়ম স্বতন্ত্র অশ্রুতপূর্ব্ব চমৎকার। যে কিছুই চাহে না,—কিছুরই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অবিরত ধন বিলাইতেছে, আপনাকে বিতরণ করিতেছে, রাশি রাশি ধন, অযাচিত হইয়াও তাহারই ক্রোড়ে, বর্ষার প্রবাহের ন্যায় আসিয়া পড়িতেছে। দান করিলেই সংসারে তাহার প্রতিদান আছে, চর্ম্মচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই, আর না পাই। সুতরাং সকল দানেই বিনিময় আছে। তাই বেচাকেনার কথা বলিয়াছিলাম। কেন না, বেচাকেনা বিনিময় মাত্র। তবে আমি যে বেচার কথা বলিয়াছিলাম, তাহা মূল্যের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া বেচা—ধারে, বেচা—মূল্য পাইব কি, না পাইব তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বেচা। কিন্তু বেচিতে হইলে, মূল্য যে ঠিক করিয়া দিতে হয়। না, এ বেচাতে মূল্য

ঠিক করিয়া দিতে হয় না। এ বেচাতে বলিতে হয় "ভাই, আমি তোমার নিকট আমাকে বেচিলাম, তোমার ইচ্ছা হয় মূল্য দিবে, ইচ্ছা হয়, না দিবে, তুমি আমাকে ব্যবহার করিলেই, আমাকে তোমার সেবাতে লাগাইলেই, কৃতার্থ হইব।" এরূপ বিক্রয় করাকে "দান" বলিলেই হয় ত ভাল হয়, এবং মূল্যের কথাটা একবারে না ভাবিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। তাই "আমাকে বেচিব" আর বলিব না। মন্দ ভাষায় ভাল ভাবও খারাপ হইয়া যায়, নির্ম্মল হৃদয়ও কলুষিত হয়, "বেচা" কথাটার অনেক সংসর্গ দোষ আছে। তাই অদ্য বলিতেছি, "আমাকে দান করিব" আমার হৃদয় লও হে, তোমাদিগের চরণে আমাকে উপহার দিব, তোমরা কেহ আমাকে নেবে গো? আমার হৃদয় নেবে গো? আমি যে রাস্তায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি, "আমার হৃদয় লও গো?" ডাকিয়া ডাকিয়া গলা পড়িয়া গেল। তবু ত আমাকে কেহ লয় না। অযোগ্য অপবিত্র দুর্ব্বল ব্যক্তি কে লইবে, কে সেবাতে নিযুক্ত করিবে? আমাকে পবিত্র না করিলে আমাকে কেমন করিয়া দান করিব,? পরহিতব্রতে নিষ্কাম ধর্ম্মে কেমন করিয়া আমাকে নিযুক্ত করিব? পবিত্র হইলেই আমাকে দান করিতে পারিব। কেন না, পবিত্র হওয়াও যা, দান করাও তাই।

সংসারে অধিকাংশ লোকে আপনাকে দান করে না। আপনাকে বেচেওনা, তাহারা আপনাকে বন্ধক দেয়। স্বার্থদাস নামে এক ব্যক্তি আমার নিকট তাহার হৃদয় এইরূপ বন্ধক দিয়াছিল। সে যে বন্ধক দিয়াছিল, আমি তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই; ভাবিয়াছিলাম, সে আমার নিকট তাহার হৃদয়কে

বেচিয়াছে। মূল্যস্বরূপ আমার ভালবাসা লইয়াছে। স্বার্থদাস তখন আমাকে খুব ভালবাসা দেখাইত, সতত আমার কাছে আসিত, কত মিষ্ট কথাই বলিত, আমার মঙ্গলের জন্য কতই ব্যাকুলতা, কতই আগ্রহ প্রকাশ করিত। তখন আমার বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে, সে আনন্দে ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া যাইত। কেবল আমার প্রশংসা করিত এমন নহে। আমি যাহাদিগকে ভাল বাসিতাম বা ভক্তি করিতাম, তাহাদিগ-কেও সে ভালবাসা ও ভক্তি জানাইত। আমি এককালে এমনি বোকা ছিলাম, শৈশবকাল হইতে মাঠের মধ্যে একা থাকিয়া থাকিয়া সংসারের ধূর্ত্ততা এমনি কম বুঝিতাম, যে স্বার্থদাসের এই সকল কথার সরল ভাব সম্বন্ধে কখন সন্দেহ করিতাম না। কেবল ভাবিতাম, লোকটা আমাকে ভাল বাসিয়া একবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছে; আমার বা আমার আত্মীয় লোকের কোন দোষই দেখিতে পায় না, কেবল গুণ দেখে। কয়েক বৎসর পরে, স্বার্থদাস একটু একটু করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমার নিকট আর পূর্ব্বের মত আসেন না, রাস্তায় যদি কখন দৈবাৎ দেখা হয়, তাহা হইলে বলেন যে, ভাই বড় ঝঞ্চটে পড়ি-য়াছি, একটুও সময় নাই, তাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া দেখি, তিনি আমার ভাল-বাসা, একখানি পত্রের মধ্যে ফেরত দিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং তাহার টুকু ফিরিয়া চাহিয়াছেন। আমি তাহার অর্থ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার কাছে বহুদর্শন নামে এক বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার অর্থ কি মহাশয়"? তিনি বলিলেন "ইহার অর্থ অতি

সহজ। তুমি বুঝিতে পার নাই, আশ্চর্য্য। তুমি মনে করিয়াছিলে যে, এই ব্যক্তি তোমার নিকট তাহার হৃদয় বিক্রয় করিয়াছে, আমি প্রথম হইতেই জানি, এই ব্যক্তি নিজের গরজে তোমার কাছে তাহার হৃদয় বন্ধক দিয়া তোমার ভালবাসা স্বরূপ টাকা ধার লইয়া নানা কাজে ও প্রয়োজনে খাটাইবে। তাহার পর, প্রয়োজন চুকিয়া গেলে, নিজের কাজ গোছাইয়া লইয়া তাহার হৃদয় ফিরিয়া লইবে।" আমি বলিলাম "স্বার্থদাস, এমন ধূর্ত্ত ও নীচাশয় তাহা আমি জানিতাম না, জানিলে বিনামূল্যে তাহার হৃদয় আমাকে সাধিয়া দিলেও আমি লইতাম না। যাহা হউক, স্বার্থদাসের অনুগ্রহে আমার একটী জ্ঞানলাভ হইল"। স্বার্থদাস না জানিয়া আমার একটী উপকার করিয়াছে, সেই অবধি আমি বন্ধকী ব্যাপারটী বেশ চিনিয়াছি। এখন প্রায় কেহই আর আমাকে ঠকাইতে পারে না, কত স্বার্থদাস প্রতিদিন আমার নিকট তাহাদিগের হৃদয় বিক্রয় করিতে আইসে, কত মিষ্ট কথা বলে, কত ধূর্ত্ত হাসি হাসে, কত ভালবাসা দেখায়, তাহাতে আর ভুলি না। এখন বেশ বুঝি, সংসারে হৃদয়ের কেনা বেচা বড় একটা হয় না। সংসারের বড় বাজারে সব জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু হৃদয় জিনিষটা তত পাওয়া যায় না। ইহার আমদানি বোধ হয় বড়ই কম।

সে কথা যাউক, কেনা বেচার কথা আমি এক্ষণে বলিতেছি না। এই হৃদয় বন্ধক সর্ব্বনেশে ব্যাপার। অনেক রমণী এই বন্ধকী হৃদয় লইয়া নিজের সমুদায় ধন, ইহকালের ও পরকালের যাহা কিছু সম্বল, স্ত্রীজাতির যাহা কিছু আদরের

যাহা কিছু সম্মানের, যাহা কিছু গৌরবের সামগ্রী আছে, সমুদায়ই হারাইয়াছে। এই বন্ধকী হৃদয়ের তরিতে যে নারী চড়িয়াছে, সেই ডুবিয়া মরিয়াছে, অথবা অনেক হাবু ডুবু খাইয়া, অনেক লাঞ্ছনা ও অনুতাপের পর, কোন প্রকারে কুল পাইয়াছে।

ভাই! তোমার যদি ধন থাকে, সাবধান। অনেক লোক তোমার নিকট তাহাদিগের অসার নীচ হৃদয় বন্ধক দিতে আসিবে, তাহাদিগের কৃত্রিম ভালবাসার ঘৃণিত অঞ্জলি দিয়া তোমাকে পূজা করিতে চাহিবে, তোমার সদ্‌গুণ তোমার অমায়িকতা তোমার মহিমাতে তাহারা মোহিত হইয়াছে, ক্রীতদাস হইয়া তোমার দ্বারে আবদ্ধ আছে, এ কথা তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিবে। সে কথা কখন বিশ্বাস করিও না। তাহাদিগের এই তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়া কখন হৃদয়ের এক কণাও তাহাদিগকে দিবে না, তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করিবে না, তাহাদিগের স্তুতিবাক্যে এক মুহূর্ত্তও মোহিত হইবে না। বরঞ্চ যদি পার, দ্বারবানকে বলিয়া দিবে "এই সকল শঠ ব্যক্তিগণকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিবে না।" যাহারা হৃদয় বন্ধক দিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা করে, তাহারা বড় ভয়ানক লোক, সতত তাহাদিগকে দূরে রাখিবে।

ভগিনি, আপনার যদি রূপ থাকে তাহা হইলে, সাবধান! আপনার কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য, কত দিক্ হইতে কত পামর তাহাদিগের অস্পৃশ্য হৃদয় আপনার নিকট বন্ধক দিবার জন্য চেষ্টা করিবে, তোষামোদের মোহন বংশীধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে সতত ঢালিয়া দিবে, এবং আপনার পাদপদ্ম ধারণ করিবার জন্য, মাথা পাতিয়া দিতে অগ্রসর হইবে। আপনি কদাচ

তাহাতে ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ইহারা আপনার হৃদয় কোন মতে কয়েক দিনের জন্যও অধিকার করিলে, তাহার অপব্যবহার করিবে, অধিক দিন রাখিতে পাইলে তাহা কলঙ্কে, পাপে, সর্ব্বনাশে পরিপূর্ণ করিয়া আপনাকে ফিরাইয়া দিবে। তাই এরূপ লোক দেখিলে, স্পষ্ট ঘৃণার নীরব পদাঘাতে তাহাদিগের ঘৃণিত হৃদয় দূরে নিক্ষেপ করিবেন। নরনারীগণ, যুবক যুবতীগণ, আপনারা এইরূপ বন্ধকী হৃদয় হইতে সতত সাবধান থাকিবেন।

বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধূরাণী।

আমি যখন বঙ্কিম বাবুর বই পড়ি, তখন আমি সময় সময় বিস্মিত হই। মনে হয়, কেমন করিয়া এই গ্রন্থকার আমার মনের কথা জানিতে পারিলেন। জীবনে এক দিন যে সুখময়ী আশা, মনোমোহন ইন্দ্রধনুবৎ হৃদয়ের কোমল আকাশে উদিত হইয়া ক্ষণকাল পরে মিশাইয়া গিয়াছিল, জীবনে একদা যে ধূমময় নৈরাশ্য শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থকার কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন? এ যে আমারই কথা। আমি ত তাহা কখন কাহাকে বলি নাই, প্রাণের বন্ধুকেও নহে। নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের নৈরাশ্য, নিজের ক্ষিপ্ততা অতিসংগোপনে হৃদয়ের গূঢ়াদপি গূঢ় প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তথাপি এই গ্রন্থকার কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন। নিভৃত গৃহে, দ্বাররুদ্ধ করিয়া একাকী নিদ্রাহীন নিশাতে, চিন্তাবাত্যাতাড়িত মস্তিস্কে করলগ্ন ললাটে, যাহা

ভাবিয়াছিলাম, তখন যে উষ্ণাশ্রু কপোলে বিগলিত হইয়াছিল, তাহার গুপ্ত ইতিহাস, তাহার অজ্ঞাত রহস্য, এই উপন্যাস-লেখক কি প্রকারে জানিলেন? "দৈব বলে না ধ্যানে?" দৈব এবং ধ্যান উভয় বলেই। কেননা, প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির দৈব-বল আছে, ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টি আছে। ইহারা এক এক শ্রেণী মনুষ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ।

আমরা সামান্য ব্যক্তি, নিজের কথাটীও ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। যদি বা দৈব বশাৎ হৃদয়ে কখন সুচিন্তার সমাগম হয়, তাহা বন্ধু বান্ধবকে বলিয়া সুখী হইব মনে করিয়া বলিতে যাই, বলিতে পারি না, মনের কথা মনেই রহিয়া যায়; চিন্তা, ভাষায় অনুবাদ করিতে পারি না। যদি কখন যন্ত্রণার মরুভূমে হৃদয় ধড় ফড় করে, সহানুভূতির শীতল বারির আকাঙ্ক্ষায়, নিজের ভাষাবলে নিজের হৃদয় অন্যের শীতল সরসীযুক্ত হৃদয় কুঞ্জে আনিতে চাই, তাহা পারি না; ভাষার দুর্ব্বল পদ ভাঙ্গিয়া পড়ে; মনের অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠে, প্রাণ হাঁকু বাঁকু করে। যদি কখন লালিত্যতরঙ্গায়িত বিশ্ব সৌন্দর্য্যের অপার সাগরে, সুখের তরণীতে ভাসমান হই; যদি কখন প্রকৃতির সঙ্গীত লহরীর তালে তালে হৃদয় নাচিতে থাকে, যদি কখন প্রকৃতি দেবী প্রাণখুলিয়া সম্ভাষণ করেন, যদি কচিৎ কবিত্বের দেবকন্যাগণ লীলাময়ী মাধুরী চোখের উপর ছড়াইয়া, আকাশ-পথে চলিয়া যান, তাহা এই হতভাগ্য শতচেষ্টা করিয়াও ভাষাতে প্রতিফলিত করিতে পারে না; লিখিতে বসিলে মূকের বাক্-পরিস্ফুটনের কষ্টময় চেষ্টার ন্যায় চিন্তা ভাবগুলি ফুটিব ফুটিব করিয়া কিছুই ফুটেনা।

আমরা সামান্য লোক, নিজের কথাই নিজে বহু আয়াসেও প্রকাশ করিতে পারিনা। আর এই মহাপুরুষগণ, অবলীলাক্রমে আমার ও তোমার বক্তব্য, কেমন সুন্দর সত্য ভাষায়, অনায়াসে প্রকাশ করিয়া দেন, ইহা দৈব বল নহেত কি? শুনিতে পাই পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বিশ্বজগতের ক্রিয়াকলাপ ও গতি একপলে সমুদয় জানিতে পারিতেন। এই কথা এখন আর মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, যাঁহাদিগের দেববল বা প্রতিভা আছে, তাহার উপর যোগবল বা অনুশীলন আছে, তাহারা চক্ষুমুদিয়া সর্ব্বতত্বভেদিনী অন্তর্দৃষ্টিতে সকলই দেখিতে পান। এইরূপ ব্যক্তির একমাত্র হৃদয়, অযুত হৃদয়ের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হইয়া, অযুত হৃদয়ের কথা একমুখে প্রচার করে। বঙ্কিমবাবু এই দেবানুগৃহীত শ্রেণীর লোক, কেশব বাবু এই শ্রেণীর লোক। আমি যখন তাঁহার সমাজে যাইতাম, আর তিনি নিমীলিত নেত্রে, তাঁহার সেই বিশুদ্ধ সঙ্গীতসমস্বরে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিতেন, তখন যেন বোধ হইত,—একি, ইনি যে আমার হৃদয়গৃহে প্রবেশ করিলেন; এ হৃদয়ের দ্বার আমার বিনা অনুমতিতে খুলিয়া আমার ঘরের খানাতল্লাসি করিতে ইহাকে কে পরোয়ানা দিল? এ যে পাতি পাতি করিয়া খুজিতেছে, আমার হৃদয়ের যে কোণে, কোলঙ্গায়, যে বাক্সে যে পাপ লুকান আছে, ইহার তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত দৃষ্টি যে তাহা টানিয়া বাহির করিতেছে। এই খানাতল্লাসি করিবার পরোয়ানা ইহাকে কে দিল? যিনি দেবাদিদেব, রাজাধিরাজ, সর্ব্বনিয়ন্তা, তিনি ইহাকে পরোয়ানা দিয়াছেন। তাই সর্ব্বহৃদয়ে ইহার অবাধ-প্রসার। সেই দেবদত্ত দলিলের জোরে কেশব

বাবু এসিয়া ও ইউরোপে স্বীয় শক্তি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশে আধিপত্য করিতেছেন।

বঙ্কিমবাবুর "দেবীচৌধুরাণী" উপন্যাস হইলেও আমরা তাহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করি। (Adam Bede) এই অর্থে এবং অধিকতর পরিমাণে ধর্ম্মপুস্তক। এই দুই খানি গ্রন্থের এবং টেনিসন্ লিখিত প্রিন্সেস্ (Princess) কবিতার ফল কথা এক। পরিবার ও গৃহধর্ম্ম নারীর উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। নানা শাস্ত্র-বিশারদ ও নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইয়াও রমণী, কোমল স্নেহ-ময়ীবৃত্তি,কোমল ভাব,ও পরিবারজন শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবেন না, সংক্ষেপে পুস্তকত্রয়ের এই শিক্ষা।

যখন সাগর দেবীচৌধুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল "এখন গৃহ-স্থালীতে মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়া দেবী-চৌধুরাণীর ভাল লাগিবে" ইত্যাদি। তখন দেবীচৌধুরাণী উত্তর করিলেন "ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রী-লোকের ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোনও যোগই কঠিন নয়। দেখ এত গুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারো কোন কষ্ট না হয়, সকলেই সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন?" এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব। টেনিসনও লীলাময়ী প্রিন্সেস্ (Princess) কবিতাতে নারীজাতিকে বলিতেছেন—

> "Live and learn and be
> All that not harms distinctive womanhood,

For woman is not undeveloped man
But diverse: could we make her as the man
Sweet love were slain; his dearest bond is this
Not like to like, but like in difference."

আডাম (Adam Bede) উপন্যাসেও Dinah প্রথমে ধর্ম্ম-প্রচারিকা, পরে বীডের সহধর্ম্মিণী। "দেবীচৌধুরাণী"র গল্পটা অতি সংক্ষেপে এখানে লেখা আবশ্যক। আমাদিগের আশা, এই সমালোচনায়, পাঠক এই গ্রন্থের গুণের যাহা কিছু অল্প আভাস পাইবেন, তাহাতে তাঁহার ঐ পুস্তক পড়িবার কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত হইবে।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর, আবার দেবী সিংহের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। এই অপ্রফুল্ল সময়ে বরেন্দ্রভূমে দুর্গা-পুর গ্রামে প্রফুল্লময়ী নামে একটি পরম সুন্দরী মেয়ে ছিল। তার মা বিধবা, গরিব। দুর্গাপুরের ছয় ক্রোশ দূরে ভূতনাথ নামক গ্রাম; সেখানে হরবল্লভ রায় নামক একজন জমীদার ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ব্রজেশ্বর—অনিন্দ্য সুন্দর পুরুষ। ব্রজেশ্বরের সহিত প্রফুল্লময়ীর বিবাহ হইল। বিবাহের রাত্রি প্রফুল্লের মা, কোনরূপে যো সো করিয়া বরযাত্রীদিগের লুচি-

মশুর উত্তম ফলাহার করাইল, কিন্তু কন্যা যাত্রীগণের কেবল চিড়া দই। এই হইল সর্ব্বনাশের গোড়া। ইহাতে দুষ্ট কন্যা-যাত্রীগণ কুপিত হইয়া প্রফুল্লের মা কুলটা জাতিভ্রষ্টা, এই কথা রটাইয়া দিল। তাহা শুনিয়া প্রফুল্লের শ্বশুর প্রফুল্লকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আর ঘরে লইলেন না। এবং ব্রজেশ্বরের আর একটী বিবাহ দিলেন। প্রফুল্ল আর তার মা এখন নিঃসম্বল— অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। প্রফুল্লের বয়স আঠার বৎসর হইল। তিনি একদিন সাহসে ভর করিয়া মাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে হাঁটিয়া চলিলেন, স্বামীর সহিত এক রাত্রি বাস করিলেন। কিন্তু ব্রজেশ্বর পিতার ভয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দুঃখিনী প্রফুল্লমুখী ভর্ত্তৃভবনে স্থান পাইল না, কেবল মাত্র সেই রজনী-সঙ্গমের নিদর্শন স্বরূপ স্বামীর একটী অঙ্গুরী নিজের অঙ্গুলীতে লইয়া, আর শ্বশুরের রূঢ় বচন, আর স্বামীর প্রেম-সম্ভাষণ স্মৃতিতে লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্লের মার শীঘ্রই মৃত্যু হইল। প্রফুল্ল এখন একাকিনী, সুন্দরী, যুবতী। গ্রামের গোমস্তা দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তীর লালসা-চক্ষু যুবতীর সৌন্দর্য্যের উপর পড়িল। একদা রাত্রিতে প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া, ধরাধরি করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া ঐ পিশাচ প্রফুল্লকে লইয়া যাইল। ইহার অর্দ্ধদণ্ড পরে প্রফুল্লের স্বামী ব্রজেশ্বর, সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া প্রফুল্লকে না পাইয়া নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইলেন। এ দিকে গোমস্তা ও বাহকগণ পাল্কি লইয়া চলিতে চলিতে, একটি ভারি জঙ্গলে আসিয়া পড়িল। সেখানে দুই জন পথিককে ডাকাত ভাবিয়া বাহকগণ পাল্কি মাটীতে ফেলিয়া দিয়া গোমস্তার সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে

পলায়ন করিল। প্রফুল্ল পাল্কি হইতে নামিয়া,যখন প্রভাত হইল, তখন একটা পথের রেখা ধরিয়া অনেক দূর গিয়া, একটী বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিলেন। তাহার ভিতরে একটি কুঠরীতে একটি বৃদ্ধ শুইয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। প্রফুল্ল গিয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সেইভগ্ন বাটিতে কোথায় অনেক ধন পোতা আছে, তাহা বৃদ্ধ প্রফুল্লকে বলিয়া দিল। প্রফুল্ল খুঁড়িয়া ধনরাশি পাইলেন। এই ধন নাকি উত্তর বাঙ্গলার রাজা নীলাম্বর, বাদশাহ প্রেরিত পাঠান সৈন্যের ভয়ে, এই স্থানে অতি সংগোপনে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর সেই জঙ্গলে এক ব্রাহ্মণের সহিত প্রফুল্লের সাক্ষাৎ হইল। ইনি গৌরবর্ণ, অতি সুপুরুষ, বয়স বড় বেশি নয়—ইহার নাম ভবানী পাঠক—নানা শাস্ত্র ব্যুৎপন্ন,অথচ ডাকাতের সরদার! এ ভবানী পাঠক প্রফুল্লমুখীকে তাঁহার শিষ্যা করিলেন। তাহার নিকট এক জন পরিচারিকা এবং নিশি নামে এক জন তাঁহার সুশিক্ষিতা শিষ্যা পাঠাইয়া দিলেন। নিশির সঙ্গে থাকিয়া, প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিলেন—কাব্য, সাংখ্য,ন্যায়, যোগশাস্ত্র এবং অবশেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিলেন। লাঠিয়ালদিগের সহিত মল্লযুদ্ধও শিখিলেন। পাঁচ বৎসরে (কতকটা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মত) শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে তিনি ক্রমে নিষ্কাম ধর্ম্মের উচ্চ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। পাঁচ বৎসরে জ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, আর পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরের কপাল ভাঙ্গিল—দশ হাজার টাকা মূল্যের তালুক খানা আড়াই শত টাকায় বিক্রি হইয়া যাইল। দিন দিন দেনা বাড়িতে লাগিল। ইজারাদার দেবী-সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। পুত্র ব্রজেশ্বর তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর ধনবান পিতার নিকট টাকার চেষ্টায় যাইলেন। শ্বশুর টাকা দিলেন না, গুণবান জামাই তাহাতে বড়ই রাগিলেন। স্ত্রীর নাম সাগর। সাগর, স্বামীর পায়ে ধরিলেন। স্নেহময় স্বামী পা জোরে টানিয়া লইলেন, সাগরের বোধ হইল, স্বামী লাথি মারিলেন। সাগর রাগিল, ব্রজেশ্বরের মেজাজ আরও গরম হইল, বলিলেন "যদি লাথি মারিয়াই থাকি, তাই কি ?" সাগর বলিলেন, "আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি এক দিন আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিবে।" ব্রজেশ্বর রাগে গরগর করিয়া ফুলিয়া চলিয়া যাইল। সাগর কাঁদিতে বসিল। তখন সহসা দেবীচৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লমুখী সাগরের ঘরে আসিল। দেবীচৌধুরাণী ডাকাত-দিগের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা। তাহার নামে এখন গৃহস্থ মাত্রেই কম্পিত।

যখন ব্রজেশ্বর শ্বশুরালয় হইতে জলপথে ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন, তখন দেবীচৌধুরাণী বজরা করিয়া সাগরকে লইয়া রাস্তাতে ব্রজেশ্বরকে নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তী ডাকাত দ্বারা ধৃত করাইলেন, আপনার বজরায় আনিলেন, সাগরের পা টিপাইয়া লইলেন, এবং নৌকাতে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা হইলে পর, তাঁহার

পিতার দেনা শোধ করিবার জন্য দেবী তাঁহাকে টাকা দিলেন এবং আর একটী আঙ্গটী দিলেন। এই আঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত আঙ্গটী-ব্রজেশ্বরদত্ত। তখনও ব্রজেশ্বর দেবীকে চিনিতে পারিলেন না। বাটী গিয়া পিতাকে টাকা দিলেন, টাকা মেয়ে-ডাকাইত দেবীর নিকট পাইয়াছেন বলিলেন। হরবল্লভ, দেবীকে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, টাকা অমুক রাত্রিতে অমুক ঘাটে দেবীকে ফেরত দিবার কথা আছে। টাকা শোধ করা দূরে যাউক, তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, "বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে।"

পুত্রের নিকট এই অভিসন্ধি গোপন করিয়া কৃতজ্ঞ হরবল্লভ রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবকে খবর দিলেন। কলেক্টরের আজ্ঞায় দস্যুনেত্রী দেবীকে ধরিবার নিমিত্ত হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া—লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান, পাঁচ শত সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

দেবী এই সমুদায় জানিতে পারিয়াও নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বামি-সাক্ষাৎ প্রতীক্ষায় আসিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আসিলেন, টাকা আনিতে পারেন নাই, দুই চারি দিন পরে দিবেন বলিলেন; তখন দেবীর সঙ্গে কোথায় দেখা হইবে জানিতে চাহিলেন। তাহার পর দুই জনে হৃদয়পূর্ণ প্রেম-সম্ভাষণ হইল। দেবী যে প্রকৃত পক্ষে ডাকাইত নহে, তাহার নামে ডাকাতি হয় মাত্র, দেবী যে যথার্থই সন্ন্যাসিনী, শ্বশুরালয়ে তাড়িতা হইয়াও পতি যে তাঁহার একমাত্র দেবতা, পতিচিন্তা দশ বৎসর কালের যে এক মাত্র ধ্যান—তাহা দেবী ব্রজেশ্বরকে বিনীত সরল ভাবে বলিলেন। শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত, আর সেই মহামহিমাময়ী স্ত্রীর

সমীপে কিছু ভীত হইলেন। ইত্যবসরে হরবল্লভকে সঙ্গে লইয়া সিপাহীগণ দেবীর নৌকা ঘেরিল। দেবী এই সময় নিজের জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল পূর্ব্বক, সাহেবকে বন্দী করিলেন, এবং হরবল্লভের, ব্রজেশ্বরের, সখীদিগের এবং আপনার জীবন রক্ষা করিলেন। পরে শ্বশুরালয়ে গৃহীতা হইলেন, এবং তাঁহার মার্জ্জিতবুদ্ধি ও নিষ্কাম ধর্ম্মগুণে, শ্বশুরকুলের সকলেই, এমন কি তাঁহার সপত্নীগণও তাঁহাতে অনুরক্ত হইলেন। তখন সেই পরিবারের সুখ ও শ্রী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গল্পের স্থূল ঘটনাগুলি এই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থে, বঙ্কিমবাবু এই একটী শিক্ষা দিতেছেন যে, পরিবারই নারীধর্ম্মের বিকাশস্থান, নারীজীবনের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। কিন্তু এই শিক্ষার অপেক্ষাও গুরুতর ও বিশালতর শিক্ষা এই ধর্ম্মগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। কি করিলে প্রকৃত পূর্ণশিক্ষা হয়, পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা কিরূপে নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হয়, নিষ্কাম ধর্ম্মে মনুষ্য জীবনের কিরূপ উচ্চতা ও সফলতা হয়, 'দেবী চৌধুরাণী'-গ্রন্থকার তাহাই কল্পনার তুলিকাতে চিত্রিত করিয়াছেন। "নবজীবনে" বঙ্কিম বাবু (Abstractএ) যাহা তর্ক বিতর্কে প্রথমে ব্যাখ্যা করেন, সেই মতই "দেবী চৌধুরাণীতে" (concrete এ) উপন্যাসাকারে প্রদর্শিত করিয়াছেন। "ধর্ম্মতত্ত্বে" বঙ্কিমবাবু শিক্ষা দিতেছেন, "নিষ্কাম ধর্ম্মই সুখের উপায়" "ধর্ম্মার্থ কর্ম্ম করিবে, কর্ম্মফলের জন্য করিবে না"। "দেবী চৌধুরাণীতে" ও দেখুন "হরবল্লভ দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত, তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম।" (পৃঃ১৫৩) আবার যখন প্রফুল্লমুখী পরিবারের সকল-

কেই সুখী করিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব যেমন অপক্ষপাতী হইয়া সকলকে আপনার হাস্য ও জীবনময় আলোক বিতরণ করেন, প্রফুল্ল সেইরূপে যখন পরিবারের সকলেরই উপর আপনার পবিত্র নিষ্কাম স্নেহ বর্ষণ করিয়া সকলকে সুখে প্লাবিত করিতে লাগিলেন, তখন উপন্যাসকার বলিতেছেন, "এই সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল, প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা, কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম, অথচ ধর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোণা হইত।" এখানে, "ধর্ম্মতত্ত্বের" মত ও শিক্ষা প্রফুল্লজীবনে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখান হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা অশরীরী, এখানে তাহা শরীরীভূত হইয়াছে, ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষার কুসুমকলি প্রফুল্লের কোমল পবিত্র হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, তাহার শোভা ও সৌরভে পাঠকের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে।

বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মতত্ত্বে শিক্ষা দিয়াছেন,—মানুষের সমুদয় শক্তিগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জ্জনী (৩) কার্য্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। দেবীচৌধুরাণীতেও বঙ্কিম বাবু তাহাই দেখাইলেন। দেবীচৌধুরাণীর শারীরিক শক্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির জন্য বঙ্কিম বাবু দেবীকে মল্লযুদ্ধ পর্য্যন্ত অভ্যাস করাইয়াছেন। এখানে বঙ্কিম বাবুর চিন্তায় স্বাধীনতার ও সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, কেবল ভারতে নহে,

ইউরোপের সভ্যতম দেশেও,অদ্যাবধি কোমল নারীদেহে ব্যায়াম-শিক্ষা ও মল্লযুদ্ধ অনাদৃত ও উপহসিত। বঙ্কিম বাবু দেবীকে কেবল মাত্র মল্লযুদ্ধ করাইয়া নিরস্ত হন নাই,তিনি পুরুষের সহিত তাহাকে মল্লযুদ্ধ করাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার চিন্তার অধিক তর সাহস প্রকাশ পাইতেছে। কমনীয় কোমল রমণীর মল্লযুদ্ধ —ইহা শুনিয়াই অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। তাহার উপর আবার মরদের সঙ্গে মেয়ের মল্লযুদ্ধ। ওমা! কি লজ্জার কথা! পাঠিকা হয় ত বলিবেন, কি বেহায়া মেয়ে! রাগী পাঠক হয় ত বলিবেন, কি বেহায়া গ্রন্থকার! আমরা ঈদৃশ পাঠক বা পাঠিকার ঈদৃশ রাগ বা লজ্জা অনুমোদন করিতে অক্ষম। বঙ্কিম বাবুর প্রদর্শিত নারীমল্লযুদ্ধে আমরা রাগে বা লজ্জায় অধীর হই নাই। প্রাচীন কালে স্পার্টা নগরে নারীদিগের মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা ও মল্লযুদ্ধ হইত। তাহাতে স্পার্টার নারী-গণ কুনীতিগ্রস্ত হয় না। বরঞ্চ ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, স্পার্টার নারীগণ গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশের নারীগণ অপেক্ষা শিষ্টা ও ধার্ম্মিকা ছিলেন।

তার পর দেখুন, গ্রন্থকার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিকাশের জন্য, দেবীকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, এবং স্ত্রীলোকে চাকুরী না করিলেও তাহার পক্ষে শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য্য, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন। "গৃহ ধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়" (দেবী চৌধুরাণী, পৃঃ ২০৪) দেবী বিদ্যাবতী বলিয়াই গৃহধর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

তৎপরে "কার্য্যকারিণী বৃত্তি"—যথা, স্নেহ, দয়া, ভক্তি।

এই গুলির স্ফূর্ত্তির ও পরিণতির জন্য দেবীকে গ্রন্থকার শেষে শ্বশুরালয়ে লইয়া গিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে না থাকিলে স্নেহ, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি সহজে ও সুন্দরভাবে স্ফূর্ত্তিও পরিণতি পায় না। তাই শেষে দেবীর পরিবারে অবস্থিতি। গ্রন্থকার বলিতেছেন, দেবী সংসারে নিজের সুখের জন্য আসেন নাই। কেন না, তাঁর কোন কামনা ছিল না। অন্যকে সুখী করিবার জন্য, নিজের হৃদয়ের স্নেহ দয়া ভক্তি শতধা অবিরল-প্রবাহী করিয়া দিবার জন্য, দেবী সংসারে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মতত্ত্বে যাহাকে অনুশীলন বলিয়াছেন,দেবীর মুখ দিয়া তাহাকে "যোগ" বলিয়াছেন, আমরা বুঝিলাম। দেবী বলিতেছেন— "যোগ অভ্যাস মাত্র, কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। * * তিনটী অভ্যাসকে যোগ বলি * * জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। জ্ঞান-যোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ।" (পৃঃ ১৪৫) অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষাতে Intellect. Will, ও Emotion এই সকল গুলিরই সম্যক্ বিকাশ ও চালনা আবশ্যক।

অবশেষে, ধর্ম্মতত্ত্বে যে "চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির" কথা বলা হইয়াছে, তাহাও দেবীর জীবনে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সেই কারণে বর্ষার পূর্ণ গঙ্গার মাঝে, বজরার উপরে, জ্যোৎস্নার আলোকে, দেবী বীণাবাদন করিয়াছেন।

দেবীর চরিত্রে ও শিক্ষাতে বঙ্কিম বাবু তাঁহার আদর্শ শিক্ষা, বা অনুশীলন, বা যোগ, বা ধর্ম্ম যাহা বল, তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমরা দেবী চৌধুরাণীকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াছি। আবার, সমুদায় পুস্তকখানিকে একটী রূপক বর্ণনা বিবেচনা করিলে, তাহার সুন্দর অর্থ হয়।

বিবেক ও বুদ্ধি।

এই রূপকে, ভবানীপাঠক বুদ্ধিশক্তি, দেবী চৌধুরাণী বিবেক বা ধর্ম্মজ্ঞান, দস্যুগণ লোভ ঈর্ষাদি রিপু। যখন বুদ্ধিশক্তি "ভবানী", বিবেক "প্রফুল্লমুখীর" শাসন না মানিয়া, তাহার অধীন না হইয়া তাহাকে নিজের বশীভূত করে, অথবা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে বন্দী রাখিয়া, কেবল মাত্র নামে তাহাকে রাজা বা রাণী প্রচার করিয়া, আপনিই সর্ব্বোচ্চ প্রভু হইয়া হৃদয়ে রাজত্ব করে, তখন হৃদয়ে রিপুদস্যুদিগের অরাজকতা, তখন হৃদয়ে পাপের অন্ধকারময় জঙ্গল, তখন কোথায়ও শান্তি নাই, কুশল নাই, মঙ্গল নাই — তখন চতুর্দ্দিকেই আতঙ্ক ও ভীতি—তখন ন্যায় নাই, বিচার নাই, স্বত্বাস্বত্বের জ্ঞান নাই—তখন "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" এই আত্মপ্রতারক কথার নামে, বিবেকহীন বুদ্ধির প্রভুত্বে, কত দিকে কত সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, কত নিরীহব্যক্তির ধন প্রাণ যায়, কত মুগ্ধ অবলার প্রাণাদপি প্রিয় ধর্ম্ম যায়। দেবী চৌধুরাণী যতদিন ভবানীপাঠকের অধীন, ততদিন দেবীর দ্বারা, অনায়াসলব্ধ ধন বিতরণ ভিন্ন কোন মঙ্গলকার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। বিবেক যতদিন বুদ্ধিশক্তির অধীন থাকে, ততদিন বিবেক দ্বারা কোন বিশেষ উপকার হয় না। ভবানী যেমন দেবীর নামে রাজত্ব করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, দেবীর সৌন্দর্য্য ও মহিমা দিয়া লোককে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সংসারে নাস্তিক বুদ্ধিও অনেক সময় ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া অন্যকে ভুলাইতে চাহে। কত সময় কুপথগামী নাস্তিক ব্যক্তি, লোককে ভুলাইবার জন্য, বক্তৃতাতে বা লেখাতে, ঈশ্বর ও ধর্ম্মের নাম

লইয়া থাকে কেন? ধর্ম্মের এমনি মহিমা, সৌন্দর্য্য ও অধিকার যে, যে স্বয়ং তাহাকে মানে না, তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করে না, তাহাকেও পদে পদে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, অন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। ভবানী অনেক কুতর্ক ও প্ররোচনা দ্বারা, দেবীকে আপনার বশে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবীর যেই চোখ মুখ ফুটিল, শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তিনি আর ভবানীর অধীনে থাকিয়া নামেও অরাজকতা এবং দস্যুবৃত্তির সহায়তা করিতে অস্বীকৃতা হইলেন, এবং নিজের স্বাধীনতা, নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিলেন। অনেক সময়, বিবেককেও বুদ্ধি নানা প্রকার কুতর্কের দ্বারা নিজের অধীনে রাখিতে চাহে। কিন্তু কোনরূপে বিবেকের একটু বল হইলেই বিবেক নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করে। লোকে বলিত দেবী ডাকাইতি করিত, কিন্তু দেবী কখন ডাকাইতি করে নাই, দেবীর নামে ডাকাইতি হইত, তেমনি অনেকে বলেন, বিবেক বা ধর্ম্ম পৃথিবীতে অনেক ডাকাইতি বা অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিবেক বা ধর্ম্ম কখন ডাকাইতি বা অত্যাচার করে নাই। তবে ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক ডাকাইতি অনেক অত্যাচার হইয়াছে বটে। দেবী বিপদে অটল, ধর্ম্মও বিপদে অটল। ধর্ম্ম মৃত্যুকে ভয় করে না, দেবী মৃত্যুকে ভয় করে নাই। ধর্ম্ম পরিবারে বা সংসারে সামঞ্জস্য বিধান করে, প্রতিযোগী অধিকার এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমবায় স্থাপিত করিয়া, আত্মার বিকাশের উপায় করিয়া দেয়। দেবী পরিবারে গিয়া স্বামীর শ্বশুর শাশুড়ী, এমন কি প্রতিযোগিনী সপত্নীদিগের মধ্যে সমবায় করিয়া দিলেন। কোমৎ বলিয়াছেন—"আমাদিগকে অন্যের জন্য জীবন যাপনার্থে

প্রবর্ত্তনা ও শিক্ষা দেওয়াই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।" দেবী চৌধুরাণীরও উদ্দেশ্য তাই। কোমতের মতে, হৃদয় বা সংসার হইতে অরাজকতাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থানে সুনিয়ম সুশাসন সংস্থাপিত করাই ধর্ম্মের কার্য্য। ধর্ম্ম—কি হৃদয়ে, কি পরিবারে, কি দেশে,—অরাজকতার মধ্য হইতে সুনিয়ম বা সমবায় বিকাশিত করে। "Religion evolves government out of anarchy, order out of chaos", কোমৎ বলেন Religion একরূপ unity বা synthesis বা harmony ঐক্য বা সামঞ্জস্য বা সমবায়। বঙ্কিম বাবু প্রকারান্তরে ইহাকেই "সমুদয় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য" বলিয়াছেন। কোমতের মতে বৃত্তিদিগের মধ্যে সমবায় স্থাপন করাই ধর্ম্মের কার্য্য। দেবীচৌধুরাণীতেও এই প্রকার সমবায়, এই প্রকার ধর্ম্ম সংস্থাপন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। আমরা পুস্তকের আরম্ভে তিন স্থানে সুশাসনের বা সমবায়ের অভাব দেখিতে পাইতেছি—দেবীর অন্তরে, দেবীর শ্বশুর পরিবারে, এবং বাঙ্গালা দেশে। পুস্তকের শেষে, দেবীর অন্তরে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনের সমবায়; তাহার শ্বশুরের পরিবারে পরস্পরের মধ্যে সমবায় বা সদ্ভাব; এবং বাঙ্গালা দেশে সমবায় বা ডাকাতি ইত্যাদির দমন এবং সুশাসন দেখিতে পাইতেছি। যে ধর্ম্ম দেশে অরাজকতার পরিবর্ত্তে সুশাসন,—পরিবারে কলহের স্থানে সদ্ভাব—এবং হৃদয়ে স্বার্থের স্থানে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রত আনিয়া দেয়, তাহারই আলোচনা করা, তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য শিক্ষা দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য উন্নতি, ভিত্তি সমবায়, উপায় বা মূলসূত্র স্নেহ। এই ধর্ম্ম কোমৎ ঈশ্বরবর্জ্জিত করিয়া ইউরোপে ব্যাখ্যা

করিতে আয়াস পাইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম বঙ্কিম বাবু ঈশ্বরযুক্ত করিয়া বাঙ্গালা দেশে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর মতে প্রফুল্লমুখী এই নিষ্কাম ধর্ম্মের অবতার। মঙ্গলের উদ্ধারের জন্য, অমঙ্গলের বিনাশের নিমিত্ত, এই নিষ্কাম ধর্ম্ম, যুগে যুগে, বুদ্ধ বা ঈশা বা চৈতন্যের জীবনে আবির্ভূত হয়। তাই প্রফুল্লমুখী গ্রন্থাবসানে বলিতেছেন ;—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

প্রফুল্লমুখী।

আমরা, এই পর্য্যন্ত, দেবীচৌধুরাণীর গুণই কেবল বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। এই পুস্তকের অনুকূলে যত কিছু বলা যায়, ইহাতে প্রশংসার যাহা কিছু আছে, আমরা তাহা এক প্রকার নিঃশেষ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেন না, পরে আমাদিগকে এই পুস্তক খানির কোন কোন বিষয়ে, বিলক্ষণ নিন্দা করিতে হইবে। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন, শিল্পীর চক্ষুতে ইহাকে দেখিলে, ইহার অনেক স্থানে, অপূর্ণতা, অপরিস্ফুটতা ও নিষ্ফলতা লক্ষিত হইবে।

এই উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি, সর্ব্বোচ্চ চরিত্র, প্রফুল্লমুখী। তিনি, গ্রন্থকারের মতে, সুশিক্ষার পরাকাষ্ঠা, নারীচরিত্রের আদর্শ, মানব হৃদয়ের পূর্ণবিকাশ, নিষ্কাম ধর্ম্মের অবতার। সুতরাং মনুষ্য চরিত্রে যাহা কিছু ভাল আছে, যাহা কিছু ভাল থাকা উচিত, তাহাই গ্রন্থকার, এই চরিত্রে, অবশ্য সন্নিবেশিত

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই চরিত্রটী ভাল ফুটে নাই, যেন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন প্রভাত অরুণের ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায়, ফুটিব ফুটিব করিয়া ফুটিল না, অনেক আয়োজন ও আশা ও চেষ্টার পর যেন কাঁসিয়া যাইল। প্রফুল্লমুখীর জীবন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) মাত্রালয়ে আঠার বৎসর; (২) বনে ভবানী পাঠকের আশ্রয়ে দশ বৎসর; অবশিষ্টভাগ স্বামী সহবাসে। প্রফুল্লমুখীর জীবনের প্রথম আঠার বৎসর পাঠকের নিকট অন্ধকার। যে জীবন পরে আদর্শচরিত্র হইল, নিষ্কাম ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ হইল, তাহার প্রথম আঠার বৎসর কিরূপে অতিবাহিত হইল; কখন কোন্ ঘটনায় কোন্ দিকে চালিত হইল—যৌবনের আরম্ভে, রূপের ও নূতন ভাবের বন্যা, যখন জীবনে প্রথম আসে, যখন প্রাণ জগতের সৌন্দর্য্য ও প্রিয়জনের ভালবাসায় অভিভূত হইবার জন্য, যেন ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, যখন সুখের আকাঙ্ক্ষার সহিত পদে পদে ভ্রম ও বিপদ সংলগ্ন থাকে, সেই সময়, প্রফুল্লমুখীর জীবন কিরূপে গিয়াছিল—তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। আঠার বৎসর বয়সে, প্রফুল্লমুখী, একমাত্র জননীকে সহায় করিয়া, বীরাঙ্গনা প্রমীলার ন্যায়, যখন শ্বশুরপুরী ভেদ করিয়া স্বামীকে অনুসরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরিচিতা হইয়াও এক রাত্রি যাপন করিয়াও, অভিশপ্তা শকুন্তলার ন্যায় প্রত্যাখ্যাতা হইলেন; তখন তাঁহার কতক পরিচয় পাইলাম। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই ভবানী পাঠক প্রভৃতি ডাকাইতদিগের জঙ্গলে আমরা আবার তাঁহাকে হারাইলাম। তখন তাঁহাকে আমরা আর বড় একটা দেখিতে পাই না; তবে বঙ্কিম বাবুর মুখে শুনিতে পাই যে,

তিনি এই এই বই পড়িতেছেন ও এই এই বিষয় শিখিতেছেন। তখন ভাবিলাম, জঙ্গলের অন্ধকারে, প্রফুল্লকে ভাল দেখিতে পাইতেছি না, বোধহয় জঙ্গলের বাহিরে যখন প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইব। তাহার পর, তাহাকে কয় বার দেখিলাম বটে, তাহার কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে বঙ্কিম বাবুর অনির্ব্বচনীয় সূর্য্যমুখী বা কুন্দ বা বিমলা বা কপালকুণ্ডলার ন্যায় একটী জীবন্ত ব্যক্তি বলিয়া, একটী পরিস্ফুট চরিত্র বলিয়া, মোটের উপর ধারণা হইল না। প্রিয়জনের প্রেতাত্মার ফটোর ন্যায়, অন্ধকার সংশ্লিষ্ট চন্দ্রালোকের ন্যায়, মধুর অথচ অস্পষ্ট—কেমন ছায়াবৎ বোধ হইল। এডাম বীড (Adam Bede) এবং ডাইনার সহিত যদি প্রফুল্লের চরিত্র তুলনা কর, তাহা হইলে দেখিবে, ডাইনার চরিত্র কত উজ্জ্বল, কত পরিস্ফুট হইয়াও কেমন স্বাভাবিক, কেমন বাস্তবিকতাময়। প্রফুল্লের চরিত্র তদ্বিপরীত।

আমরা বলিয়াছি, প্রফুল্ল-চরিত্র ভাল ফুটে নাই। কেন তাহা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রফুল্লের বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাই নাই। ২৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও প্রফুল্লের বিদ্যা বুদ্ধি কার্য্যে প্রকাশ পাইল না। (৬৭ পৃঃ) গ্রন্থকারের মুখে শুনিলাম "প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ —তাহার প্রমাণ তিনি খুব শীঘ্র শীঘ্র পড়া মুখস্থ করিতে পারিতেন এবং এখনকার কলেজের উপাধিমাত্র লোলুপ অসার ছাত্রগণের মত, কয়েক খানি কাব্য একটু Logic একটু Philosophy সব একটু একটু করিয়া শিখিতে পারিয়াছিলেন। আর শেষে সবিস্তারে যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

১৮ বৎসর হইতে ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের হাতের গড়া পুতুল। এই সময় তাহার কোনও স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন কার্য্য, স্বাধীন চিন্তা, দেখিতে পাই না। সে কাষ্ঠের পুত্তলি, ভবানী ঠাকুর তাহাকে যে দিকে ফিরাইতেছেন, সে সেই দিকে ফিরিতেছে, কখনও কোন আপত্তি, কোনও প্রতিবাদ করিতেছে না—পরের ইচ্ছার প্রতিকূলে, কখন স্বীয় ইচ্ছা প্রবল করিবার আয়াস পাইতেছে না; তাহার কার্য্যে কখনও চুক্ দেখিতে পাইতেছি না, চিন্তায় কখন আবিলতা দেখিতে পাইতেছি না, কর্ত্তব্যের এবং কামনার ভিতর মনুষ্য জীবনে নিয়ত যে বিবাদ হয়, তাহার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। জিনোফন বর্ণিত সাইরসের শিক্ষাপ্রণালী, এবং রুসো কল্পিত এমিলের শিক্ষা পদ্ধতি, অনেকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বিবেচনা করেন। আমাদিগের বোধ হইতেছে, ঐ দুই গ্রন্থে বর্ণিত শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা প্রফুল্লের শিক্ষা অধিকতর অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। সে কথা যাউক।

২৮ বৎসরের পরেও প্রফুল্লের বিশেষ বুদ্ধিব্যঞ্জক কার্য্য দেখা যায় না। সাহেবের হাত হইতে শ্বশুর, স্বামী, এবং আপনাকে রক্ষা করিবার সময় বোধ হয় যেন গ্রন্থকার একবার প্রফুল্লের বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু যাহাকে প্রফুল্লের "গভীর কৌশল' বলিয়াছেন, তাহা এত ক্ষুদ্র এবং অনুপযুক্ত যে আমরা বঙ্কিম বাবুর নিকট তাহা কখন প্রত্যাশা করিনাই। যখন কোনও গ্রন্থকার তাঁহার কোনও নায়ক ও নায়িকাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সহসা "বৈশাখীর

নবীন-নীরদ-মালায় গগন অন্ধকার" করিয়া নদী বক্ষে "প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা" আনয়ন করিতে বাধ্য হন, তখন বোধ হয় কেবল নায়ক নায়িকা বিপন্ন নহে, গ্রন্থকারও বিপন্ন। তখন গ্রন্থকারের কৌশল, এবং নায়ক ও নায়িকার বুদ্ধিমত্তা দৃশ্যপট হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন নায়ক নায়িকার (এবং গ্রন্থকারের) রক্ষার জন্য ভগবানকে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে হয়। তাই বিপন্না প্রফুল্লকে বলিতে হইয়াছে "আমার রক্ষার জন্য ভগবান উপায় করিয়াছেন।" আমাদিগের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখককে এইরূপ Deus ex machina এর আশ্রয় এইরূপ "ভগবানের" উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহা আমরা প্রত্যাশা করি নাই।* "যখন গ্রন্থকার বলিলেন প্রফুল্লের মনের ভিতর গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম না জানি কি একটা কাণ্ড হইবে। ওমা! পরে দেখি কেবল একটী ঝড় উঠিল, আর সেই ঝড়ে যদি কাহারও কিছু কৌশল বা শিক্ষা প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা প্রফুল্লের নহে, তাহা নাবিকদিগের। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে দেখিলাম, "শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও কাজ করিতেন না; তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাঁহাদের এতটা শ্রদ্ধা হইল।" এখানে প্রফুল্লের বিবেচনার প্রমাণের ভার তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর উপর দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত—কি দরিদ্র মাত্রালয়ে, কি দস্যুব্যাপ্ত বিপদসঙ্কুল গহন কাননে, কি শান্তিময় শ্বশুরালয়ে প্রফুল্লের চমৎকারিণী বুদ্ধিমত্তা কার্য্যে প্রকটিত হইল না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাইলাম না।

* প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক লিটনের এইরূপ দোষ আছে।

প্রফুল্লের নিষ্কাম ধর্ম্মও কার্য্যে বড় উজ্জ্বল ভাবে প্রস্ফুটিত হয় নাই। প্রফুল্ল কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইচ্ছাপূর্ব্বক কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহা তাহার কার্য্যে আমরা কোথায়ও দেখিতে পাই না। প্রফুল্ল দরিদ্র-কন্যা, তাহাতে আবার হিন্দুমহিলা, বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে পতিই দেবতা; তাহার উপর আবার সেই পতি ধনী, রূপবান যুবক—সেই পিতৃমাতৃহীনা নিঃসহায়া নিরাশ্রয়া হিন্দুযুবতী কুলবধূর পক্ষে ঈদৃশ পতির অনুসরণ বা ধ্যানে আমরা বিশেষ ত্যাগস্বীকার বা নিষ্কাম ধর্ম্ম দেখিতে পাইলাম না। যে কোনও হিন্দুমহিলা ঐরূপ অবস্থায় পড়িবে, সে যদি কুলটা না হয়, তাহা হইলে, নিষ্কাম ধর্ম্মের বিনা সাহায্যেই আপনা হইতেই স্বামী-সহবাস-লালায়িতা, ভর্তৃ-ভবন-প্রয়াসিনী হইবে। ইহার জন্য নিষ্কাম ধর্ম্মের উত্তেজনার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই, সকাম ধর্ম্মের প্ররোচনাই যথেষ্ট। নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রধান পরীক্ষা, ধর্ম্মবলের অভ্রান্ত পরিচয়, ত্যাগ স্বীকার। প্রফুল্ল যখন বনে থাকিত, তখন অনেক টাকা বিতরণ করিত সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার ত্যাগস্বীকার প্রকটিত হয় নাই। কারণ, প্রফুল্ল, সহায়হীনা অবলা, দেশ অরাজক; সুতরাং প্রফুল্ল ইচ্ছা করিলেও এই সম্পত্তি স্বয়ং রক্ষা করিতে পারিতনা। তাহার উপর আবার তাহার কেহই ছিলনা। কাহাকে লইয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? একা ঐশ্বর্য্য ভোগকরা হয় না, এই যথার্থ কথা ভবানীঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যে অর্থ প্রথমতঃ রক্ষা করাই নিতান্ত কঠিন, দ্বিতীয়তঃ রক্ষা করিতে পারিলেও, সঙ্গ অভাবে যাহাতে সুখভোগের সম্ভাবনা নাই, তাহার বিতরণে আমরা প্রফুল্লের চরিত্রে বিশেষ মহিমা বা

ত্যাগ স্বীকার দেখিতে পাইলাম না। ভর্ত্তৃভবনে তাহার কার্য্যে ত্যাগ স্বীকার প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকারের মুখে শুনিতে পাই, কিন্তু চোখের উপর তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না।

নায়ক ব্রজেশ্বরের চরিত্র ঘৃণার্হ, অথচ গ্রন্থকার সুবিধা পাইলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। পাষণ্ড হরবল্লভ বলিল, (ব্রজেশ্বর) "তুমি আজ রাত্রে তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ঝাঁটা মেরে তাড়ায়ে দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।" পাষণ্ড পুত্র অমনি বলিল "যে আজ্ঞা"। হিন্দুপিতৃভক্তি কি স্ত্রীকে ঝাঁটা মারিতে উপদেশ দিয়াছে? নিঃসহায়া নিরপরাধিনী শরণাগতা ভার্য্যাকে ঝাঁটা মারিবার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার হওয়া পিতৃভক্তি নহে। তাহা কাপুরুষতা ও নীচতা। থাক্যারে রচিত ভ্যানিটী ফেয়ার (Vanity Fair) উপন্যাসে একটী চিত্র দেখুন। নায়ক "অসবর্ণ" এমিলিয়া নাম্নী রমণীকে ভাল বাসেন। এমিলিয়াও তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভাল বাসেন। উভয়ের বিবাহ হইবে স্থির হইল। পিতা এই ভালবাসা বরাবর অনুমোদন করিয়াছেন, বিবাহেও পূর্ণ সম্মতি দিয়া আসিয়াছেন। এমিলিয়ার পিতা সহসা দরিদ্র হইয়া যাইলেন, অমনি অসবর্ণের পিতা অসবর্ণকে বলিলেন "তুমি এমিলিয়াকে বিবাহ করিতে পাইবে না। বিবাহ করিলে আমি তোমাকে বাড়ী থেকে দূর করিয়া দিব।" পুত্র বলিলেন—"পিতঃ আপনার এই অনুচিত আজ্ঞা আমি পালন করিতে পারি না। এমিলিয়া এখন গরিব হইয়াছে, সেই নিমিত্ত তাহাকে ত্যাগ করিলে বড়ই নীচতা ও কাপুরুষতা হইবে। আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না।" আপনি বলেন, আমি এই দণ্ডেই বাটী হইতে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু

পিতা পুত্রকে তাড়াইয়া দিলেন। এখানে আমরা পুত্রের উদারতার ও সাহসের প্রশংসা করি।—আর গুণনিধি ব্রজেশ্বর! কর্ত্তব্যের আজ্ঞা যে পিত্রাজ্ঞার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা ইংরাজপুত্র বুঝে আর হিন্দুপুত্র তাহা কি বুঝেনা? ব্রজেশ্বরের পিত্রাজ্ঞাপালনই বা কোথা? যে প্রফুল্লকে পিতার আজ্ঞায় ঝাঁটা মারিতে সম্মত হইয়াছিল, সেই প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পিতাকে লুকাইয়া, রাত্রিতে তস্করের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। পবিত্র পিতৃভক্তি কখন তস্করবৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে না। কাপুরুষ ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি ছিলনা, পিতৃভয় ছিল।

ব্রজেশ্বর কেবল কাপুরুষ নহেন। ব্রজেশ্বর নিতান্ত নীচাশয়। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার লইতে আসিয়াছেন। শ্বশুর টাকা ধার দিলেন না। তাঁহাতে শ্বশুরের উপর ভারি চোট। চোট করিয়া খুব ধমক খাইলেন। ধমক খাইয়া রাগটা পদলুণ্ঠিতা স্ত্রীর উপর ঝাড়িলেন। স্ত্রীকে লাথি মারায় কিছু লজ্জার বিষয় আছে, তাহা মনে করিলেন না। যখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, আমায় লাথি মারিলে" তখন নীচাশয় কাপুরুষ লাথি না মারিয়াও বলিল "যদি মারিয়া থাকি, তুমি না হয় বড় মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার, তোমার বড় মানুষ বাপও এ পা পূজা করিয়াছিলেন।" বঙ্কিম বাবুর অবশ্য এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, আমাদিগের দেশে কুলীন জামাতাগণ ব্রজেশ্বরের মত নীচাশয়, শ্বশুরের নিকট টাকা না পাইলে স্ত্রীকে অপমান করে।

ব্রজেশ্বরের যে অতিরিক্ত সত্যবাদিতা ছিল না, তাহা গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন (দুই?) "একটা Lie direct সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না"। গ্রন্থকার প্রফুল্লকেও

এক স্থানে মিথ্যা কথা কহাইয়াছেন (১৭০ পৃঃ)। দুই স্থানেই যেন গ্রন্থকার "অবস্থা বিশেষে" মিথ্যাবাদিতার অনুমোদন করিয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মনীতির প্রতি ভ্রূকুটি করিয়াছেন। ঐ দুই স্থানে "অবস্থা বিশেষ" অর্থে নিজের অর্থাৎ ব্রজেশ্বরের ও প্রফুল্লের সুবিধা বুঝায়। সুতরাং গ্রন্থকারের যেন মত এই বোধ হয় যে, নিজের সুবিধার জন্য দুই একটা মিথ্যা কহিলে দোষ নাই। এই মত অশ্রদ্ধেয়, অবশ্য বলিতে হইবে। আমরা দেবী চৌধুরাণীকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াছি। কারণ নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ধর্ম্মগ্রন্থ দুই এক স্থানে ধর্ম্মবিরোধী মতে দূষিত হইয়াছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। আমরা এই পুস্তকের আর দোষ কীর্ত্তন করিতে চাহি না, ইহার যাহাই দোষ থাকুক না কেন, বঙ্গভাষায় ইহা একটি অমূল্য রত্ন। যাহার বিদ্যাবুদ্ধির উপর গভীর ভক্তি আছে, এবং যিনি বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের পথ-প্রদর্শক, তাঁহার গ্রন্থের দোষ বিবৃত করা বড় অসুখকর কার্য্য। কর্ত্তব্যানুরোধে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বে করিলাম।

বঙ্কিমবাবু। *

বিদ্যমান।

বঙ্কিম চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য-সংসার আঁধার করিয়া জাতীয় সাহিত্য-সিংহাসন খালি করিয়া, বঙ্কিম চলিয়া গিয়াছেন।

* ১৩০১ সালে লিখিত ও প্রকাশিত।

দেশের লোক, আবালবৃদ্ধবনিতা "হা বঙ্কিম, হা বঙ্কিম" করিয়া কাঁদিতেছেন। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে সকলেই কাঁদিতেছে। বঙ্গের অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ বাহিরের কোন খবরই রাখেন না, লেখা পড়ার মধ্যে কেবল একটু বাঙ্গালা পড়িতে পারেন। তিনিও বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতি উপন্যাস পড়িয়া আনন্দরসে উচ্ছ্বলিত হইয়াছেন। আর যে বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অকূল সাগরে ভাসিয়াছেন, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক পড়িয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র লীলা লহরীতে আন্দোলিত হইয়াছেন। তাই বঙ্কিমের শোকে, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, আবালবৃদ্ধবনিতা অদ্য অধীর।

কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যেন শোক করিবার কারণ নাই। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমার পিতৃদেবের বিয়োগে আমি একটা শিক্ষা পাইয়াছি;—যাঁহারা খুব বড় ও মহৎ, তাঁহারা মরেন না। শোকের অন্ধকারে, দিন কতক মাত্র তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। পিতৃদেব যখন স্বর্গারোহণ করিলেন, দিন কতক "কোথায় যাইলেন, কোথায় যাইলেন" বলিয়া কাঁদিলাম। কিন্তু যখন মোহ দূর হইল, দুঃখরজনী অবসান হইল, বুদ্ধির আলোক ফুটিল, তখন পিতৃদেবকে আবার দেখিতে পাইলাম। এ আর সে দেহ নহে, এ নূতন দেহ। আগেকার সুন্দর দেহ হইতে এখনকার দেহ সুন্দরতর। সে দেহ বয়সে কথঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়াছিল, এ দেহ নূতন। সে দেহ চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পাইতাম, এ দেহ মর্ম্ম বা দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পাইতে লাগিলাম। বুঝিলাম—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই-রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।"

কিন্তু এই কথা গীতাকার যে ভাবে লিখিয়াছেন, আমি তাহা হইতে একটু পৃথক ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। যখন শোকের বেগ কমিল, তখন পুনর্ব্বার গৃহে পিতৃদেবের আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। যে ঘরে তিনি বসিয়া লিখিতেন, পড়িতেন, বোধ হইত তিনি আবার সেই ঘরে বসিয়া পূর্ব্বের মত লিখিতেছেন, পড়িতেছেন। কখন বা বোধ হইত, তিনি বেড়াইতেছেন। দেহের সেই গম্ভীর কনক কান্তি কত সময় যেন চক্ষুর উপর দেখিতাম। আবার যখন উদ্যানের দিকে তাকাইতাম, তখন তাঁহার রোপিত বৃক্ষাবলী, তাঁহার খাত সরোবর, তাঁহার নির্ম্মিত গৃহ—যে দিকে তাকাই, সকল বস্তুতেই তাঁহার সত্তা, তাঁহার আত্মা, তাঁহার শোভা দেখিতে পাইতে লাগিলাম। এমন কি, উদ্যানের বায়ু যেন তাঁহার পবিত্র নিঃশ্বাসে অনুপ্রাণিত, সেই কানন-মৃত্তিকা যেন তাঁহার পাদস্পর্শ-পূত হইয়া যাইল। তাঁহার পবিত্র বাসনিকেতন আমার নিকট শ্রেষ্ঠতীর্থভূমি হইল। ব্যক্তি বিশেষের নিকট যেমন পিতা, বিশেষতঃ ঋষিতুল্য পিতা, জাতীয় সাহিত্য পক্ষে তেমনি মহা গ্রন্থকার। বঙ্কিম বাবু, মহাজন। মহাজন গুরু। গুরু পিতৃ-তুল্য। তাই বলিতেছিলাম, বঙ্কিম বাবু, বর্ত্তমান বঙ্গীয় গ্রন্থকার-

গণের নিকট পিতৃ-তুল্য। পিতার বিয়োগে যেমন সন্তানগণের শোক হয়, বঙ্কিমবাবুর বিয়োগে অদ্য বঙ্গ-সাহিত্য-সেবিগণ সেই-রূপ শোকাকুল। কিন্তু শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস এখন গিয়াছে। এখন আবার আমরা চৈতন্যলাভ করিয়াছি। এখন আমরা বুঝিতেছি, বঙ্কিমবাবু আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। তিনি আমাদিগের হৃদয়ের গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলিতে, তাঁহার জীবনের স্মৃতিতে, তাঁহার মানস পুত্রবৃন্দে, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গসাহিত্য অদ্য তাঁহার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত, তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার পাদস্পর্শপূত, বঙ্গসাহিত্য সাধকের একটি নূতন তীর্থভূমি।

সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিভার প্রভা। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিম-রবি-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথবাবুর শকুন্তলাতত্ত্ব, বঙ্কিম-বাবুর উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্বোধিত। তাঁহার হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখরবাবুর উদ্ভ্রান্ত প্রেম, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের এক খানি মাত্র কাগজ পরি-বর্দ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ সুরের মধ্যে একটী সুর মাত্র গীতি-পুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয়বাবু "বঙ্গদর্শনে," "সাধারণীতে," "নবজীবনে" বঙ্কিমবাবুর মেধাবী শিষ্য, রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমবাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া, লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিমবাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দর মিশ্রিত করিয়াছেন। রমেশবাবুর "বঙ্গবিজেতা" বঙ্কিমবাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্রবাবুর "আর্য্যদর্শন" "বঙ্গদর্শনের" অনুযাত্রী।

আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিম তাঁহাদিগের সাহিত্য জীবনের প্রবৃত্তি বা জন্মদাতা, তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিম চন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি। তবে কেন না বলিব, বঙ্কিম বিলীন হন নাই। এক বঙ্কিম্ চন্দ্র, শত বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া, শত লেখকের মস্তিষ্কে বিভাষিত দেখিতেছি। সেই শত মস্তিষ্ক হইতে আবার শত নবকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের অংশে প্রসূত হইবে।

দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গসাহিত্য-জগতে ভূতকালে যাহা কিছু ভাল ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সারাংশ বর্ত্তমানে আকর্ষণ করিয়া, নিজের প্রতিভা দ্বারা তাহা উজ্জ্বলীকৃত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ক্রমিক উন্নতির অনন্ত পথে তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে বিরাজ করেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ নিজেই কতক পরিমাণে ভূত ভবিষ্যতে বর্ত্তমান। ভূতকালে যাহা ভাল ছিল, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আকৃষ্ট ও ধৃত; বর্ত্তমান কালের যাহা ভাল আছে, তাহা ঘনীভূত; এবং ভবিষ্যতে যাহা ভাল হইবে, তাহা তাঁহাদেরই উৎকর্ষলাভের ফল। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার রচিত গ্রন্থ এবং তাঁহার রচনা-প্রণোদিত লেখকবৃন্দ, এ সকল কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের ভিতর, তাঁহার প্রতিভায় উন্মেষিত প্রতিভা-সম্পন্ন গ্রন্থকারগণের ভিতর, তাঁহার সহস্র পাঠকের হৃদয়দর্পণের ভিতর, যুক্তিমূলক হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের চেষ্টার ভিতর, ঐক বঙ্কিমচন্দ্রকে সহস্রধা দেখিতে পাইতেছি। অদ্য বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ বঙ্কিমময়। জাহ্নবীকূলে তাঁহার

চিতার যে পাবকশিখা উত্থিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার প্রতিভাবহ্নি আরও দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিত না,মানিত না, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেছে, মানিতেছে, আরও চিনিবে, আরও মানিবে, বঙ্কিম-প্রতিভায় তাঁহাদিগের আঁধার হৃদয় অলোকিত হইবে।

ইংরাজি না বাঙ্গালা।

ইংরাজি উপন্যাসকার থ্যাক্যারে তাহার জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালা উপন্যাসকার বঙ্কিম বাবুও নাকি বলিয়াছেন যে, বার বৎসরের মধ্যে যেন কেহ তাঁহার জীবনচরিত না লিখেন। থ্যাক্যারের অনুরোধ পালিত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর আদেশ পালিত হইবে কি না, তাহা জানি না। কিন্তু আমি তাঁহার জীবনবৃত্ত লিখিয়া তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত নহি। প্রধানতঃ বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কয়েকটী কথা নিবেদন করিতে চাহি।

ইংরাজি ভাষায় বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ দখল ছিল। বঙ্কিম-হেষ্টি যুদ্ধে, বঙ্কিমের ইংরাজির শক্তিতে, ইংরাজি-নিপুণ হেষ্টিকে অস্থির হইয়া "ধন্য ধন্য" বলিতে হইয়াছিল। এমন কি, তখন কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমের ইংরাজি অধিক মিষ্ট বা বাঙ্গালা অধিক মিষ্ট,তাহা আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু ইংরাজিতে এমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও,তিনি ইংরাজি রচনাতে যশোলাভ করার কুহকে মজেন নাই,মাতৃভাষা-সেবা-পরাঙ্মুখ হন নাই। সত্য বটে, তিনি বাল্যবয়সে Raj-Mohan's Wife নামে একখানি ইংরাজি উপন্যাস লিখিয়া-

ছিলেন। মধুসূদন প্রথমে The Captive Lady নামক এক-খানি কাব্য বিদেশীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই জনেই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, দুই জনেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, বঙ্কিম, শীঘ্র,—মধু, বিলম্বে। তাঁহারা ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া একজন বঙ্গভাষাতে নূতন গদ্যে অমৃত ঢালিয়া দিলেন, আর এক জন নূতন পদ্যে অপূর্ব্ব 'মধুচক্র' রচনা করিলেন।

উদ্‌ভ্রান্ত সাহেবিয়ানাপ্রিয় মধুসূদন শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেনঃ—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে' (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

* * * *

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই? যারে ফিরে ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

বঙ্কিম বাবু বাল্যকালের পর আর "পরধন লোভে মত্ত" হন নাই, পরধন ভিক্ষা করেন নাই, অল্প বয়স হইতেই তিনি মাতৃ-ভাষা রূপ খনিতে মণিজাল আহরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হয় নাই।

অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি কোন পরকীয় ভাষাতে আদর্শ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। যদি কেহ অমর বা স্থায়ী গ্রন্থ লিখিতে চাহেন, তাঁহাকে মাতৃভাষাতে রচনা করিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্য-যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের একমাত্র সোপান মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সহজ পথ, আপামরসাধারণের কর্ণ-স্বরূপ। মাতার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্য পান করিতে করিতে, মাতার অমিয় ক্ষরিত মধুর বচনে যে ভাষা শুনিয়াছ,—পিতার ক্ষেমঙ্কর গম্ভীর উপদেশে যে ভাষা শুনিয়াছ, সহোদরার কোমল কমনীয় স্মিত সম্ভাষণে যে ভাষা বিভাষিত, প্রেয়সীর প্রাণারাম প্রণয়-পুষ্পাঞ্জলি যে ভাষায় স্বামীচরণে নিবেদিত, যন্ত্রণায় প্রাণ ছটফট করিলে যে ভাষায় ভগবানকে ডাকি, অন্তিম কালে গঙ্গাতীরে [illegible] হইলে যে ভাষায় পতিতপাবনের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করে—বাল্যে বার্দ্ধক্যে, স্বাস্থ্যে রোগে, শোকে প্রণয়ে, উৎসবে বিপদে, জীবনে মরণে, যে ভাষা প্রাণের সহিত জড়িত;—সেই মাতৃভাষা, সেই চিরপ্রিয়া, চিরপূতা, চিরপূজনীয়া মাতৃভাষা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ভাষা কি আছে? জাতীয় হৃদয় আয়ত্ত করিবার, প্রশস্ত করিবার, এমন ক্ষমতা-শালিনী শক্তি আর কিসের আছে? স্বদেশব্যাপিনী সহানুভূতি, মহীয়সী প্রতিভার সহিত মিশ্রিত হইলে, স্বতঃই মাতৃভাষা-ক্রোড়ে গড়াইয়া পড়ে, অকপট প্রেমে স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের গলা জড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া আলাপ করিতে আরম্ভ করে। স্বজাতির নিকট যদি কাহারও কোন সংবাদ প্রচার করিবার থাকে, মাতৃভাষা তাহার অবশ্য অবলম্বনীয়। স্বদেশে, ধর্ম্ম প্রচারে,

গভীর ও বিস্তৃত রাজনৈতিক প্রচারে, জ্ঞান প্রচারে, মাতৃভাষা একমাত্র সম্বল। মহাপণ্ডিত বুদ্ধদেব মাতৃভাষায়, জনসাধারণের ভাষায়, তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার শিষ্য বলিলেন "প্রভু, সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিলে ভাল হয় না কি?" সর্ব্বজীবের দুঃখে আর্দ্রহৃদয় বুদ্ধদেব বলিলেন "না, আমার ধর্ম্ম জনসাধারণের জন্য। হে ভিক্ষুগণ! আমার উপদেশ বাক্য তোমরা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিওনা। জনসাধারণের ভাষায় আমার ধর্ম্ম প্রচার হউক!" ঈশা মাতৃভাষায় তাঁহার প্রেম ও দয়ার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। কেশব শেষ কালে দিন দিন মাতৃভাষা অধিকতর আশ্রয় করিতেছিলেন। (Wesley) ওয়েসলি ঢিবিতে দাঁড়াইয়া বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমাগত ১০।১৫ হাজার কুলিকে মাতৃভাষায় ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন; মূর্খ অনক্ষর কুলিমজুর মাতৃভাষার দ্রাবক শক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যাইত, তাহাদিগের ধূলি-ধূসরিত বদনমণ্ডল ভগবদ্ প্রেমাশ্রুর রজত ধারাতে উজ্জ্বল হইত; কত কুলিমজুর হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছা যাইত, চৈতন্য-সংকীর্ত্তনে ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় ধরাতলে লুণ্ঠিত হইত।

এই ওয়েস্‌লির ধর্ম্ম আপামর সাধারণের নিকট প্রচারিত হইল, আপামর সাধারণের চরিত্র প্রভূতরূপে সংশোধিত করিল। যেখানে জাতীয় চরিত্র সংশোধিত হইবে, সেখানে রাজনৈতিক সংস্কার আপনিই হইবে। সুতরাং ইংরাজের চরিত্র সংশোধন হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কার সম্পাদিত হইল। এমন কি, একজন বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বলেন যে, আধুনিক সংশোধিত ইংরাজ চরিত্র ও সংশোধিত ইংরাজ-শাসন-

তন্ত্র, আপামর সাধারণের ভিতরে ওয়েস্‌লির ধর্ম্ম প্রচারের দূরগামী ফল! আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইলে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। তাই বঙ্কিম বাবু তার স্বরে বলিয়াছেন, "এরূপ কথনও কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, অথচ ভদ্র-লোকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন।" তাই সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে না। বাঙ্গালায় তুমি যে কথা বলিবে না, তাহা চারি কোটি বাঙ্গালী বুঝিবে না, শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক কোন বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাই যতদিন রাজনৈতিক আন্দোলক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক, জাতীয় নেতৃগণ বাঙ্গালা ভাষায় আপনাদের মন্তব্য না প্রচার করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা অতি সহজ কথা। এ কথা কৃত-বিদ্য বাঙ্গালীরা আজিও যে সকলে বুঝেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। শুনিতেছি, "বঙ্গবাসী"র অদ্য বিশ হাজার গ্রাহক। বঙ্গ-দেশে কোন্‌ ইংরাজি পত্রের অদ্যাবধি ইহার সিকি গ্রাহক হইয়াছে? বিংশতি সহস্র গ্রাহক! প্রত্যেক কাগজ খানির যদি পাঁচজন করিয়া পাঠক ধরা যায়, প্রতি সপ্তাহে ১ লক্ষ লোক বঙ্গবাসী পড়িয়া থাকে। দেখুন, লোক-শিক্ষা প্রচা-

রের কি চমৎকার, কি বিশাল যন্ত্র! ইহার সম্পাদক যদি দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি এবং সর্ব্বোত্তম দেশহিতৈষণা সমন্বিত হন, তাহা হইলে দেশে উন্নতির স্রোত চতুর্দ্দিকে কি অচিন্ত্য দ্রুতবেগে বিক্ষিপ্ত হয়! আবার, ইংলণ্ডের মাসিক পত্র Review of Reviews এর সহিত Helpers নামক স্বদেশ-হিত-সাধক সভা যেমন সংযোজিত হইয়াছে, মার্কিন পত্র Arenaর সহিত Union for Practical Progress সভা যেমন সংস্থাপিত হইয়াছে, তেমনি যদি বঙ্গবাসীর সহিত, প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক গ্রামে এক একটী দেশহিত-করী সভা গঠিত ও সংলগ্ন থাকে এবং নগরবাসী এবং পল্লিগ্রামবাসিগণ যদি এই সকল সভা দ্বারা সদনুষ্ঠানে, সংস্কার-কার্য্যে, "বঙ্গবাসী" দ্বারা উচিতভাবে শিক্ষিত, চালিত ও সমন্বিত হয়,—তাহা হইলে কি একটা বিচিত্র অপূর্ব্ব কাণ্ডের সংঘটন হইতে পারে! বাঙ্গালা ভাষাতে এই ব্যাপার সম্ভবপর, ইংরাজিতে নহে। আবার, বাঙ্গালা উপন্যাস ভাল হইলে কত বাঙ্গালীতে পড়ে। উপন্যাস জনসমাজের শিক্ষাদাতা। ডিকেন্সের উপন্যাসে বিলাতে স্কুলের ও জেলের সংস্কার হইয়াছে। Uncle Tom'sCabin উপন্যাস পাঠে, দাসের পদযুগল হইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছিল। রমেশ-বাবুও মাতৃভাষায় লিখিত উপন্যাসের শক্তি বুঝেন। তাই দেখিতেছি, তিনি সমাজের দোষ গুলি উপন্যাসে উজ্জ্বল-ভাবে বিচিত্র করিতেছেন। তাই বলি, বক্তৃতাতে বল, সংবাদ পত্রে বল, উপন্যাসে বল, নাটকে বল, বাঙ্গালা ভাষাতে বঙ্গ সমাজের যে সংস্কার ও উন্নতি হইতে

পারে, তাহা ইংরাজীতে কদাপি হইতে পারে না। ইংরাজির প্রয়োজন নাই, তাহা বলি নাই। সাহেবদিগকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা ইংরাজিতে অবশ্য বক্তব্য। সমুদয় ভারতকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা ইংরাজিতে বক্তব্য। কিন্তু যাহা কেবল বাঙ্গালীকে বলিতে হইবে, তাহা বাঙ্গালাতে বলিতে হইবে, ইংরাজীতে নহে। হে স্বদেশীয় সুশিক্ষিতগণ, বাঙ্গালীর শ্রোতব্য কথা ইংরাজিতে বলিয়া বা লিখিয়া আপনাদিগকে আর বিড়ম্বিত করিবেন না, দেশের অগণ্য লোককে আর বঞ্চিত করিবেন না। বঙ্কিমবাবু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করুন, তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা অনুসরণ করুন। বিপুল গৌরব আপনাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের সর্ব্বজনীন মঙ্গল আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রহিয়াছে।

সাধুভাষা না চলিত ভাষা।

বঙ্কিমবাবুর স্বাধীন প্রবৃত্তি, যেমন একদিকে, তাঁহাকে ইংরাজি ভাষার দাসত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তেমনি অন্য-দিকে, তাঁহার বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃতের অতিশাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বে, সংস্কৃত না জানিলে যেন কাহারও বাঙ্গালা লেখার অধিকার ছিল না। লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার বিচ্ছেদ ছিল। কোনও গুরুতর বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ না করিলে, লেখা মঞ্জুর হইত না। বঙ্কিমবাবু চতুষ্পাঠিতে রীতিমত পড়িয়া ও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার রচিত গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, কথিত ভাষার যথাযোগ্য

প্রভুত্ব সংস্থাপন করিলেন। এক সময় লোকে তাঁহাকে ইহার জন্য পরিহাস করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, বঙ্কিমি ভাষা পিত পুত্রে এক সঙ্গে পড়া যায় না। কিন্তু এখন সেই ভ্রম অপনীত হইয়াছে। এ দিকে, বঙ্কিমের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরল ভাষা আরও সরল হইয়াছে। "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্র" তাহার প্রধান প্রমাণ। এত কঠিন বিষয়, সূক্ষ্ম বিচার, বঙ্কিমবাবু কেমন সরল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। যেখানে গভীর বিজ্ঞতা, সেখানে সরলতা। অলঙ্কারের পরাকাষ্ঠা, সরলতা। বঙ্কিম-বাবু কতকটা সংস্কৃত বর্জ্জিত করিয়া, প্রচলিত কথা অধিকতর সন্নিবেশিত করিয়া, বাঙ্গালাকে অধিকতর বাঙ্গালা করিয়াছেন। ইহাও বঙ্কিমের স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ পরিচয়।

স্বাধীনতা।

ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের স্বাধীনতা যাহা, তাহা বলিলাম। এখন চিন্তা সম্বন্ধে বলি। বঙ্কিমের স্বাধীন প্রবৃত্তি অনুবাদমার্গ অনুসরণ করে নাই! কেবল বিদেশীয় চিন্তা স্বকীয়-ভাষা-পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাঁহার প্রতিভা পরিতৃপ্ত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে পূজ্যপদ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মাননীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এক অপূর্ব্ব সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য রচনা প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর রচনার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহাতে কেহ এমন মনে না করেন, আমি বঙ্কিম গুণকীর্ত্তনে,বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা যে কত ঋণী, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষাতে এক নবযুগ সৃষ্টি করিয়া-

ছিলেন এবং ঐ যুগের অবতার তিনি। বঙ্কিমবাবু তাহার পর আর এক যুগের অবতারণা করিলেন এবং তিনি এই যুগের দিগন্তবিচারী বিজয়ী বীর, অনুশীলনের অবতার। বাঙ্গালা ভাষা-সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌বংশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বঙ্কিম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, এবং তাঁহার বিবিধ-বিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা, রাজ্যের সীমা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। বঙ্গের সিংহাসন এখন খালি। এমন কাহাকে দেখি না, যিনি বঙ্কিমের স্থানে বসিবার যোগ্য।

আমি বঙ্কিমের স্বাধীন চিন্তার কথা বলিতেছিলাম। তিনি যে ডার্বিন স্পেন্সরের ন্যায় কোন একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কোন একটা নূতক মত, নূতন চিন্তা জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে, তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত শাস্ত্র একটু নূতনভাবে বুঝাইয়াছেন। ইংরাজি বিজ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের দীপে, সংস্কৃত শাস্ত্র ইউরোপীয় আলোকে, পাঠককে নূতন ভাবে দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের তিনটী যুগ আছে (১) অনুবাদ যুগ, (২) অনুরচনা যুগ, (৩) মূল রচনা যুগ। ইংরাজি সাহিত্যের সংঘর্ষণে এবং বাঙ্গালীদিগের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা বশতঃ, অন্য দেশে দুই শতাব্দীতে সাহিত্যের যে পরিমাণে বিকাশ হয়, আমাদিগের দেশে এক শতাব্দীতে সেই পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে। এক শতাব্দীতে সাহিত্যের দুইটী যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৃতীয় যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ, অনুবাদের যুগ, আধুনিক বাঙ্গালা-

গদ্যের সৃষ্টির যুগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বঙ্কিমবাবুর যুগ, অনুকরণ বা অনুরচনার যুগ। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কেবল-মাত্র অনুরচনাতে নিঃশেষ হন নাই, তিনি অনুরচনার যুগের শেষভাগে মূল রচনার আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান ছিল যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষার লেখক হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, "যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র। ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?" তখন সুশিক্ষিতে বাঙ্গলা পড়িত না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িত না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহিত না। "লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে, তাহাদিগের নিকট যশ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না।" সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে কেন? কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা পড়িত না কেন? বাঙ্গালার মূল রচনা ছিল না বলিয়া, বঙ্কিমবাবু তাঁহার মধুর উপন্যাসে, তাঁহার প্রতিভান্বিত "বঙ্গ-দর্শনে," পাঠ্য মূল রচনা বাহির করিলেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা আদরে পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার আদর বাড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা বঙ্কিমবাবুর স্বাতন্ত্র্যের আর একটী পরিচয়। সেদিন বাঙ্গালা দেশের একজন

প্রধান চিন্তাশীল এবং ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি আমাকে বলিলেন যে, "এখনও বাঙ্গালা ভাষায় মূল রচনা করিবার সময় আসে নাই। এখন ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করা উচিত। অনুবাদ করিতে করিতে ভাষা যখন পুষ্ট হইবে, তখন তাহা মূল রচনার যোগ্য হইবে।" ইহার উত্তর,—যাহারা কেবলমাত্র বাঙ্গালা জানে, তাহারা এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ বুঝিবে না। যাঁহারা ইংরাজি ও সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা মূল গ্রন্থ ছাড়িয়া অনুবাদ গ্রন্থ পড়িবেন কেন? অনেক দিন পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু এই কথা বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন।

স্বাধীনভাব বঙ্কিমবাবুর জীবনের সকল বিষয়েই পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমবাবু চাকুরী করিতেন। চাকুরী করিয়াও এমন স্বাধীন ভাবে ও তেজের সহিত চলিতেন যে, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মাত্রই তাহা অনুভব করিতেন। কোন সাহেবের বাটীতে তিনি জীবনে কখনও দেখা করিতে গিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিন্দা বা প্রশংসা গ্রাহ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার যেরূপ সর্ব্বমুখী দক্ষতা, আপনি অমুক কার্য্যবিভাগে সেরূপ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।" তাহাতে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"ঐ বিভাগে আমার দক্ষতা বুঝিতে সক্ষম এমন কোন কর্ম্মচারী আছেন?" আমাদিগের দেশের লোকে হাকিম হইলে আপনাকে বড়লোক বিবেচনা করে, তাহাদিগের সহিত দেখা হইলে তাহাদিগের দাসত্বমূলক তুচ্ছ প্রভুত্বের কত জারি জুরি করে, সাহেব চরণারবিন্দবন্দনার হেয় কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া কত সুখী হয়। বঙ্কিমবাবুর জীবনের শেষ

বৎসরে আমি তাহার নিকট শুনিয়াছিলাম—"আমি বিবেচনা করি, চাকুরী আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য।" এখন কত শিক্ষিত ব্যক্তি "বাবু"ত্যাগ করিয়াMr. লাভ করিবার জন্য লালায়িত। একজন "মিষ্টার" উপাধিধারী বাঙ্গালী সিভিলিয়ান,বঙ্কিমবাবুর নামের সহিত Mr. যোগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম তাহার উত্তরে লিখিয়া দিলেন যে "আমাকে 'মিষ্টার' না লিখিয়া 'বাবু' লিখিলেই আমি যথেষ্ট সুখী হইব"। বঙ্কিমবাবুর এই উত্তর পড়িয়া বাঙ্গালী "মিষ্টার" লজ্জাতে অধোবদন হইলেন।

এই ইংরাজি-ক্ষিপ্ত যুগে, ইংরাজি ভাষাতে যশোলাভ করা, ইংরাজি পোষাকে দীপ্তি পাওয়া, ইংরাজি "মিষ্টার" শব্দে গৌরবান্বিত হওয়ার আকাজ্ক্ষা তাঁহার কখনও দেখি নাই।

দেশের ভিতর বঙ্কিম বাবু অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার সমালোচনা অনেক সময় অতি তীব্র হইত। কিন্তু তিনি শত্রুতা বা দ্বেষে কখন তাঁহার লেখনীকে বিষ-প্রলিপ্ত করেন নাই, এবং মিত্রতাতে কখন অনুচিত প্রশংসা করেন নাই। সাহিত্যের এজলাসে, বঙ্গদর্শনের চৌকিতে বসিয়া, তিনি স্বাধীন ও অপক্ষপাতভাবে রায় ফয়সলা লিখিতেন। আবার কেহ তাঁহার নিজের লেখার প্রাতিকূল সমালোচনা করিলে তাহাতে তিনি চটিয়া লাল হইতেন না, বরঞ্চ বিশেষ উদারতা দেখাইতেন। প্রায় ১০ বৎসর হইল তিনি "সুখ স্ফূর্ত্তি ও অনুশীলন" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখেন। আমি "নব্যভারতে" তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং আমার বিবেচনায় তাঁহার যে গুলি ভ্রম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া-

ছিলাম। এই প্রবন্ধে আমার নাম প্রকাশ করি নাই, "মীমাংসা-প্রার্থী" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার কয়েক দিন পরে আমি বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি এইবার আমার প্রতি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে মনে করিলাম, বঙ্কিম বাবু জানেন না যে, আমি "মীমাংসা প্রার্থী" নাম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের নিন্দা করিয়াছি। একটু কথার পরে তিনি বলিলেন, "তুমিই কি মীমাংসা প্রার্থী?" ইহার পূর্ব্বে—"বঙ্গবাসী"তে তাঁহার রচনার কোন কোন ভাবের বিরুদ্ধে আমি তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও বঙ্কিম বাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহ আমার প্রতি কখনও ন্যূন হয় নাই। আমি বঙ্কিম বাবুর স্বাধীন ভাবের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, এখন বঙ্কিম বাবুর সমন্বয়ের ভাব সম্বন্ধে বলিব।

সমন্বয়।

প্রাচীনকালে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, কেবল মাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া,আপনাদিগের জীবনের পথ নির্দ্ধারণ করিতেন। পরে ইংরাজ শাসন প্রচলিত হইল। ইংরাজি-সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইল। এ দেশের লোক ইংরাজির সাহিত্যের চক্রে ঘুরিতে লাগিল। এই সাহিত্য-চক্রের বেগ প্রচণ্ড। আবার সেই বেগে আমাদিগের দেশের লোক অনভ্যস্ত। সুতরাং তাহাদিগের মাথা ঘুরিয়া গেল। ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় শাস্ত্র-কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া বিশৃঙ্খলা-ব্যোম-

মার্গে ছুটিতে লাগিল। পরে,—মোক্ষমূলর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবদিগের হিন্দু-মহিমা-প্রচার হেতুই হউক, অথবা "থিয়সফি" সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন বশতঃই হউক, অথবা একটী ক্রিয়া অতিরিক্ত হইলেই প্রতিক্রিয়া তাহার প্রতিকার করে, এই সাধারণ নিয়ম বশতঃই হউক, অথবা দৈবানুগ্রহেই হউক—কিয়ংকাল পরে ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিল, স্বক্ষেত্রজাত ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি আলোচনা করিতে লাগিল। এইরূপে, একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান, অন্যদিকে সংস্কৃতশাস্ত্র, একদিকে প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাব, আর এক দিকে নূতন জড়বাদ-পরিণত বিজ্ঞানতত্ত্ব, এক দিকে জাতীয় আকর্ষণ শক্তি, আর একদিকে বিজাতীয় বিপ্রকর্ষণ শক্তি—এই দুইটী শক্তির অধীন হইয়া জাতীয় জীবন উন্নতির নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থগুলিও এই দুইটী স্বতন্ত্র শক্তির সমন্বয়ের ফল। তিনি ইংরাজি সাহিত্যচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়াও, সংস্কৃত শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—বঙ্কিম বাবু হিন্দুদিগের দুর্জ্ঞেয় সাংখ্যদর্শন, অত্যুন্নত গীতাধর্ম্ম, বহু পল্লবিত পুরাণ মর্ম্ম, অপূর্ব্ব-সমাজ-তত্ত্ব, নব্য হিন্দুদিগের বোধগম্য ভাবে ও বিলাতি যুক্তি প্রণালী দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক স্থানে ইউরোপীয় শিক্ষার ফল এবং সংস্কৃত শিক্ষার ফল সমন্বিত করিয়াছেন। এই সমন্বয়ে বঙ্কিম, শাস্ত্র এবং যুক্তির, যথাসাধ্য সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাই তিনি এই বচন—

কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানি সংজায়তে॥

তুলিয়া প্রচার করিয়াছেন, শাস্ত্র আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্তু কেবল মাত্র শাস্ত্র আশ্রয় করিলে চলিবে না, বিচার কালে শাস্ত্র এবং যুক্তি, উভয়ই প্রয়োগ করিতে হইবে। কেন না, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। বঙ্কিম বাবু, হিন্দুশাস্ত্র ও বিলাতি বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও যুক্তি, সংরক্ষণ ও উন্নতি, Conservatism ও Liberalism, এই উভয়ের সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। "অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদ"কে তিনি বড় ভয় করেন। কেন না, বিচ্ছেদে বিপ্লব, সমন্বয়ে ক্রম-বিকাশ। তিনি বলেন,—দেখুন।

"প্রাচীন ঋষিগণ প্রথমে বিচার করিলেন যে, স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। পরবর্ত্তী ঋষিরা দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রগণের পক্ষে শিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের ব্যবস্থা "রিপীল" করিলেন না। কিন্তু স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণের শিক্ষার জন্য মহাভারত ইত্যাদি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিলেন। Female education and mass education, স্ত্রীশিক্ষা ও শূদ্রশিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন।"

বঙ্কিম বাবু বলেন, হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, হিন্দুসমাজে যে সকল প্রথা আছে, হঠাৎ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন না করিয়া ক্রমে ক্রমে বুঝিয়া সুজিয়া, উপযোগী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া, সমাজকে সংশোধিত করিতে হইবে। ইহাই বঙ্কিম বাবুর শিক্ষা। খ্রীষ্ট আমাদিগের জাতীয় আদর্শ নহে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের জাতীয় আদর্শ। খ্রীষ্টের আদর্শ আমাদিগের চক্ষে না ধরিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ আমাদিগের অধ্যয়ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। এবং এই আদর্শে যেখানে বিকৃতি বা অপভ্রংশ হইয়াছে, তাহা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা স্থির করিয়া প্রকৃত আদর্শ চরিত্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া-

ছেন। এই কৃষ্ণ চরিত্র নির্দ্ধারণ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার অনেক স্থলে সংশয় আছে। কিন্তু আমি ইহাতে বঙ্কিম বাবুর উজ্জ্বল জাতীয় ভাব ও প্রদীপ্ত প্রতিভা, এবং সমন্বয়ের ভাব দেখিতে পাইতেছি। বঙ্কিম বাবুর সমন্বয়ের ভাব আর এক বিষয়ে দেখিতে পাই। তিনি মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন কেন? তাহার একটী কারণ, দেশের উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর সমন্বয় করিবার জন্য। তিনি বলিয়াছেন, আমাদিগের উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্র, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। এই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুতরাং যে ভাষায় লিখিলে এই পার্থক্য নষ্ট হয়, সেই ভাষায় লেখা উচিত।

উন্নতি।

স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য, এই দুইটী গুণে বঙ্কিম বাবু দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সাহিত্যে, বঙ্কিম বাবুর স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন সমাজ-সংস্কার দেখি। বঙ্কিম বাবু স্বীকার করেন যে, গৃহস্থালী স্ত্রীলোকের প্রধানধর্ম্ম। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ নহেন। বিরুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকে যদি Miss Fawcett এর মত First wrangler হয়,

তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই! বঙ্কিম বাবু কেবল স্ত্রীশিক্ষা নহে, তিনি নারীদিগের উচ্চ শিক্ষার পোষক। তাই তাঁহার প্রফুল্লকে (দেবীচৌধুরাণীকে) ব্যাকরণ, ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা, সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, যোগশাস্ত্র পড়াইলেন। পরে তাহাকে রাণীগিরি করাইলেন। তাহার পর তাঁহাকে পতি-পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিতে সংসারে আনিলেন। সংসারে আসিবার পূর্ব্বে প্রফুল্লকে তাহার সপত্নী সাগর জিজ্ঞাসা করিল।

"এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া, ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর রূপ কথা ভাল লাগিবে? যাহার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হরির মা, প্যারির মার হুকুম বরদারি কি আর ভাল লাগিবে?"

প্রফুল্ল উত্তর দিল,—

"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি, এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রী-জাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।" প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল, তার কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। * * সে যে অদ্বিতীয় মহামহো-পাধ্যায়ের শিষ্য—নিজে পরম পণ্ডিত, সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহ ধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়।"

দেখুন, বঙ্কিম বাবু উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গৃহস্থালীর কেমন সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শিক্ষিত স্ত্রীলোককে Ouida-নিন্দিত বিলাতের এই যুগের "The new woman?" করিয়া

তুলেন নাই, অথবা Primrose League এর Countess of Jerseyতে পরিণত করেন নাই। দেখুন, প্রফুল্লতে বিদ্যার ও গৃহস্থালীর সমন্বয়, সংসার ধর্ম্ম আর নিষ্কাম ধর্ম্মের সমন্বয়। বঙ্কিম বাবু যদি আর কিছু না লিখিয়া কেবল মাত্র দেবীচৌধুরাণী লিখিতেন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতাম। আবার, রাজনীতিতেও দেখুন, একদিকে হিন্দু-দিগের যোগ বল, আর একদিকে সাহেবদিগের বিজ্ঞান বল, এই দুইটীর সমন্বয়ে উন্নতির কথা তিনি তাঁহার "আনন্দমঠে" প্রচার করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু স্বাতন্ত্র্য ও সামঞ্জস্য অবলম্বন করিয়া ক্রম উন্নতির যে চরম উন্নতি তাহাতে অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন এবং কোমতের সঙ্গে একস্বরে বলিয়াছিলেন,—

"The general law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that man becomes more and more Religious."

আমরা বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে প্রথমে দেখিতে পাই, (ক) Religion of (conjugal) Love, তার পর (খ) Religion of Patriotism, অবশেষে (গ) Religion of Humanity. কিন্তু এই Religion of Humanity কোমতের নিরীশ্বর religion নহে, ইহা Religion of Humanity plus God. বঙ্কিম বাবুর হৃদয়ের ত্রিধারা, স্বাতন্ত্র্য, সামঞ্জস্য ও উন্নতি, এ পথ সে পথ দিয়া, শেষে ভক্তি-সাগরাভিমুখে প্রবাহিত। বঙ্কিম বাবু যখন এই সাগর সঙ্গমে উপনীত, তখন ভগবদ্গীতা উচ্চারণ করিলেন। (ঘ) তখন তিনি সর্ব্বশিক্ষার চরম শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, ধর্ম্মের

উন্নতি ব্যতীত জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই; জাতীয় চরিত্রের উন্নতি ব্যতীত সামাজিক উন্নতি বল, রাজনৈতিক উন্নতি বল, সবই মিছা, সবই অসম্ভব। এই কথা নূতন নহে, অতি প্রাচীন কথা। কিন্তু বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কোলাহলের মধ্যে এই প্রাচীন কথা ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই প্রাচীন কথা নূতন করিয়া প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছে, বঙ্কিম বাবু তাহা করিয়াছেন।

জাতিভেদ।

প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের গৌরব স্মৃতি।

আমি অদ্য ব্রাহ্মণদিগের বিষয় লিখিব মনে করিতেছি। আবার ভাবিতেছি, আমি ব্রাহ্মণদিগের বিষয় কি লিখিব? আমি ভারতের অধঃপতিত সন্তান, ঘৃণিত অধীন বাঙ্গালি— আমি সেই দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষদিগের, মহীয়ান্ আর্য্য ঋষি-দিগের বিষয় কি লিখিব! তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতি, তাঁহা-দিগের অতুলনীয় গৌরব আমার লেখনী স্পর্শে কেন কলুষিত করিব? প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের গৌরবময় কার্য্য পরম্পরা সম্যগ্ বর্ণনা করিতে পারে, এমন লোক ভারতে কেহ নাই। আমার ত কথাই নাই। গৌরবময় পিতার সমাধি মন্দিরে গিয়া যেমন অযোগ্যপুত্র অশ্রুবর্ষণ করে, আমিও তেমনি আজি

প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের গৌরবের সমাধি মন্দির, এই ভারতে অশ্রু বর্ষণ ভিন্ন আর কি করিতে পারি? অনেকবার ভাবিয়াছি, আর তাঁহাদিগের বিষয় ভাবিব না। ভাবিয়াও সুখ পাই না, ভাবিতে বসিলে জীবনের আঁধার রজনী আরও আঁধার হইয়া যায়। যে আজন্ম গরীব, অন্নবস্ত্রহীন সে খুব দুঃখী সন্দেহ নাই। কিন্তু যে এক দিন লক্ষপতি ছিল, কিন্তু অদ্য বিধির বিপাকে অন্নের কাঙ্গাল, পথের ভিখারী, সে তাহার অপেক্ষাও শতগুণে দুঃখী। পূর্ব্বের সুখ ভাবিয়া তাহার কষ্ট আরও কষ্টকর হয়।—"এখন নাই, পূর্ব্বে ছিল" এই কথাটী বলিতে বুক ফাটিয়া যায়। স্বাধীনতা, সভ্যতা, গৌরব—যাহা কিছু আদরণীয়, যাহা কিছু পূজনীয়, "এখন নাই, পূর্ব্বে ছিল" এই কথা বলিতে ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে বাগ্‌রোধ হইয়া যায়। প্রভুত্ব গেল, স্বাধীনতা গেল, সভ্যতা গেল, পবিত্রতা গেল—পূর্ব্ব পুরুষদিগের সঙ্গে সঙ্গে সকলই গেল—কেবল আমরা, তাঁহাদিগের অযোগ্য ও অধম সন্তান, বাঁচিয়া রহিলাম! কেন? আমরা যদি না বাঁচিয়া থাকিতাম, পবিত্র বিপ্রবংশ জগতে কলঙ্কিত হইত না। আমরা ব্রাহ্মণ, তেজোময় ঋষি সন্তান, বিদ্যা বুদ্ধি, ও ধর্ম্মে জগতের চিরন্তন শিক্ষক ও শাসক—অদ্য ম্লেচ্ছদিগের পদতলে লুণ্ঠিত, রাস্তায় ঘাটে গাড়িতে, শৃগাল কুকুরের ন্যায়, লাথি খাইতেছি, লাথি খাইয়া অম্লানবদনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। হে বিভো! কেনই বা আমাদিগকে উচ্চে তুলিয়াছিলে, আর যদি বা তুলিলে, কেনই বা আবার এত নীচে নিক্ষেপ করিলে? কি অপরাধে এত গুরুতর দণ্ডবিধান করিলে? তোমার রাজ্যে আমরা প্রথম শ্রেণীর চিহ্নিত কর্ম্মচারী ছিলাম। কাহার উপর

অত্যাচার করিয়াছিলাম, তোমার প্রদত্ত ক্ষমতা কবে অপব্যবহার করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে একেবারে প্রথম শ্রেণী হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে 'ডিগ্রেড্' করিয়াদিলে; আমাদিগের সমুদয় ক্ষমতা, আমাদিগের সমুদয় সম্মান, কাড়িয়া লইলে? আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে একদিন শূদ্রদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার জন্যই কি এই মর্ম্মভেদী দণ্ড হইতে পারে?

যাহা হউক, ব্রাহ্মণ শব্দটী এখনও আমার নিকট বড় প্রিয়। ইহা যেন ভারতের অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। একটী ক্ষুদ্রশব্দে কতগুলি ভাব নিহিত রহিয়াছে, কত বৎসরের স্রোত ইহাতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। কত অগণনীয় ঘটনা এই শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জননী যেমন মৃত প্রাণাধিক পুত্রের মূর্ত্তি মানসনেত্রে দেখিতে দেখিতে, অশ্রুসিক্ত হইয়াও, গভীর দুঃখের ভিতরে, কেমন একরূপ গভীরতর সুখপান, অথবা হিন্দু-বিধবা যেমন মৃত স্বামীর দেবমূর্ত্তি হৃদয় মন্দিরে অশ্রুবিগলিত নেত্রে আরাধনা করিয়া শান্তি পান, আমি তেমনি অস্ত ব্রাহ্মণ গৌরবের স্মৃতি ধারণ করিয়া, প্রাণের ভিতর গভীর দুঃখের মধ্যে গভীর সুখ পাইতেছি—ঘোর অন্ধ রজনীতে দূরে দীপালোক দেখিতে পাইতেছি। সেই সুখময় অতীত কালের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কখন কখন বর্ত্তমান দুর্গতি ভুলিয়া যাই—তখন অতীত কাল যেন বর্ত্তমান হইয়া যায়, তখন অন্ধকার দূরে যায়, আনন্দের আলোকে হৃদয় বিকীর্ণ হয়, তখন আশাহীন ও নিস্তেজ মন আশ্বস্ত ও সতেজ হয়। তখন আমি ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীতের তেজ ও অর্থ বুঝিতে পারি।

প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ, তিনগাছি সূক্ষ্ম সূত্রে কি কাণ্ড কারখানা-টাই করিয়া গিয়াছিলেন! তিনগাছি মাত্র শ্বেত সূক্ষ্ম সূত্রে, কি চমৎকার ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারই সংসাধন করিলেন।

হে সূত্র, তোমার মহিমা, তোমার পবিত্রতা, তোমার প্রতাপের ইয়ত্তা নাই। একদিন পবিত্র তপোবনে আর্য্যঋষিগণ তোমাকে ধারণ করিয়া পূত হইয়াছিলেন। সংসারে এমন কোনও "নক্ষত্র" যুক্ত ফিতা নাই, এমন কোনও উপাধিযুক্ত "গাউন" নাই, এমন কোনও সম্মানসূচক চিহ্ন নাই, যাহার সহিত তোমার তুলনা হইতে পারে। তুমি সি, আই, ই, কে সি এস, আই, রাজা, মহারাজা, আর্ল, ডিউক পদসূচক চিহ্ন অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ, অধিকতর মহীয়ান্। তুমি দুই হস্ত মাত্র পরিমিত হইয়াও, একটা বিশাল সাহিত্য, উচ্চতম সভ্যতা—একটা সমগ্র মানসিক জগৎ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। তিনগাছি সূত্র! তুমি দর্শন, তুমি কবিত্ব, তুমি বিজ্ঞান। তুমি জ্ঞান, তুমি অনুভূতি, তুমি অনুষ্ঠান। তুমি শ্বেত, কেননা তুমি পবিত্র। তুমি সূক্ষ্ম, কেননা, তোমার আধিপত্যের কারণ অতি সূক্ষ্ম—মানসিক ও নৈতিক বল,—স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ তাহা সহজে অনুভব করিতে পারে না। পয়সায় তোমার মূল্য অতি অল্প, কেন না তোমার শক্তি ধনমূলক নহে। কি আশ্চর্য্য কৌশলে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ, এই তিনগাছি সূত্রের গ্রন্থি দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সেই গ্রন্থি খুলিতে পারেন নাই, চৈতন্যদেব সেই গ্রন্থি খুলিতে পারেন নাই, কোরাণ এবং বাইবেল সেই গ্রন্থি খুলিতে পারে নাই। ইংরাজি শিক্ষাও সেই গ্রন্থি খুলিতে পারে নাই, তবে "গার্ডিয়ান্" গ্রন্থির ন্যায় কাটিবার চেষ্টা করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ-

গুণ! সেই গ্রন্থি কর্ত্তিত হইবে কিনা, অতীত কালের একমাত্র সুখ নিদর্শন নষ্ট হইবে কি না, তাহা তোমাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা কি সহজে, উদাসীন ভাবে, সেই গ্রন্থি ছেদ করিতে দিবে?

তোমাদিগের পিতৃ পুরুষের একমাত্র রক্ষিত পবিত্র ধনে তোমরা কি সহজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চিত হইবে?

হে ব্রাহ্ম ভাই! আমি তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রকে সম্মান করি; তুমি কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য যে সহস্র কষ্ট স্বীকার করিতেছ, তাহার জন্য আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করি। তথাপি হে প্রিয় ব্রাহ্ম ভাই! যজ্ঞোপবীতের প্রতি তোমার অনাস্থা আমি অনুমোদন করিতে পারি না। আমি আজি কালির "নব্যহিন্দু" বা "পুনরুত্থানকারী" নহি বটে, সাম্যের উপাসক হইতে ইচ্ছা করি বটে, তথাচ আমি মমতা ত্যাগ করিয়া এই সূত্র ত্যাগ করিতে পারি না। যেমন কোনও প্রাণ স্বরূপ প্রিয়তম মৃত ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় আমাকে যে স্নেহের স্মৃতি চিহ্ন সাদরে দিয়া গিয়াছেন, তাহা কখন ফেলিয়া দিতে পারি না, ফেলিয়া দিবার কথাটী শুনিলেও হৃদয়ে বড় বাজে, তাহা মনে করাও যেন পাপ বোধ হয়; তেমনি আর্য্যঋষিগণ, আমাদিগের পিতৃ পুরুষগণ, আমাদিগকে যে স্মৃতিচিহ্ন দিয়া গিয়াছেন, যাহা এত পবিত্র, তাহা ফেলিয়া দিতে পারি না, তাহা ফেলিয়া দিবার কথা মনে করিলেও প্রাণে ব্যথা পাই। দুর্ভাগ্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, যেন ঐ সূত্র ধরিয়া কোনও রূপে বাঁচিয়া আছি, ছাড়িয়া দিলেই ডুবিয়া মরিব, নীচতার অতলস্পর্শ গহ্বরে নামিয়া যাইব। এই সূত্রে এখনও

ব্যাস, বাল্মীকি, কপিল, পতঞ্জলি, কালিদাস, ভবভূতি, আর্য্যভট্ট ভাস্করাচার্য্য, পরাশর পাণিনি, আমার সহিত গ্রথিত, তাহা অনুভব করিতে পারি।

না, আমরা যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিব না; জগতের উচ্চতম কুলে জন্মিয়াছি, তাহা ভুলিব না; যজ্ঞোপবীতের আবার যাহাতে সম্মান হয়, আবার যাহাতে তাহা নূতন সাহিত্যে, নূতন বিজ্ঞানে নূতন দর্শনে, অসংশয়িত পবিত্রতায় পুনর্ব্বার জ্যোতির্ম্ময় ও পূজনীয় হয়, তাহার চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণগণ পুরাকালের পুরোহিত ও শিক্ষক। পুরোহিতের ও শিক্ষকের প্রয়োজন জগতে চিরকালই থাকিবে।

পৌরহিত্য সংসারে চিরকালই থাকিবে। যাঁহারা জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত, তাঁহারা অজ্ঞান ও অধার্ম্মিকদিগকে চিরকালই উপদেশ দিবেন। এই পৌরহিত্য যখন জ্ঞান ও ধর্ম্ম ও ন্যায় বিবর্জ্জিত হয়, তখনই কেবল সমাজের অহিতকর হয়; নতুবা নহে। আসুন, ব্রাহ্মণগণ, আমরা যাহাতে আবার সমাজের হিতকর পুরোহিত হইবার যোগ্য হইতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টা করি।

সাম্য, ভূদেববাবু ও চন্দ্রনাথবাবু।

এদেশে প্রথমে যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই জাতিভেদের বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি হিন্দু সমাজে একটী পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। কতকগুলি লোক ইংরাজিশিক্ষা পাইয়াও জাতিভেদের জীর্ণ ও ভগ্ন দুর্গ সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে

করেন, এখন চতুর্দ্দিকে যেরূপ ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের গোলা গুলি ছুটিতেছে তাহাতে জাতিভেদ স্বরূপ দুর্গ হিন্দুসমাজের একমাত্র আশ্রয়, তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। তাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে যেন তুরীনাদে বলিতেছেন :—

"ভাই হিন্দু! খবরদার, জাতিভেদ দুর্গ ছাড়িও না। এ দুর্গ বড় কৌশলে নির্ম্মিত। মনু পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণের অপূর্ব্ব 'এঞ্জিনিয়ারি' ইহাকে (জাতি) ভেদের মসলায় গড়িয়াও দুর্ভেদ্য ও অজেয় করিয়াছে। তোমরা যদি এই দুর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব-'প্ল্যান' একবার বুঝিয়া আয়ত্ত করিতে পার এবং স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া ইহার রক্ষাকরণ পক্ষে যত্নবান হও, তাহা হইলে বিলাতি শিক্ষার কামান ইহার কিছুই করিতে পারিবে না। আর যদি এই দুর্দ্দিনে এই দুর্গ ছাড়িয়া, জাতিভেদশূন্য সমতলক্ষেত্রে আসিয়া, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই মরিবে"

এই দলের দুই জন নেতা। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক চিন্তাশীল গ্রন্থে (২২৮—২৪০পৃঃ) জাতিভেদ প্রথার গুণ কীর্ত্তন ও পোষকতা করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার মনোহর হিন্দুত্ব পুস্তকে (৩১৩—৩১৭পৃঃ) জাতিভেদ প্রথার অপার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। ভূদেব বাবু (জাতি) ভেদে মিল দেখিয়াছেন। চন্দ্র-বাবু (জাতি) ভেদে সাম্য দেখিয়াছেন। কথাটা বিস্ময় জনক। কিন্তু সার উইলিয়াম হামিল্টন ঠিক বলিয়াছেন যে সংসারে এমন কোন মত নাই, যাহা কোনও না কোনও দার্শনিক সমর্থন করেন নাই। উপস্থিত বিষয় ভূদেব বাবু ও চন্দ্রনাথ

বাবুর অধিকাংশ যুক্তিই আমি বুঝিতে পারি নাই। আধুনিক হিন্দু সমাজের প্রবর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের মধ্যে, প্রচীন জাতিভেদের সারাংশ কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে, তাহাও আমার উপলব্ধি হয় নাই।

যাহা হউক, ভূদেব বাবুর ও চন্দ্রনাথ বাবুর কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত। আমি তাঁহাদিগের যুক্তি যথাসাধ্য আলোচনা করিব। কিন্তু কাহারও যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার প্রতি অন্তরে গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব থাকিলেও, প্রতিবাদের ভাষা অসম্মানের ভাষা বলিয়া সহসা বোধ হয়। তাই পূর্ব্বে বলিয়া রাখিতেছি, ভূদেববাবু এবং চন্দ্রনাথ বাবুকে আমার শিক্ষক স্থানীয় মনে করি। তাঁহাদিগের রচনা পাঠ করিয়া আমি শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি।

জাতিভেদ সমর্থনকারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই জাতিই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মহিমাতে মুগ্ধ হইবেন, যে বর্ণভেদমাহাত্ম্যে তিনি মর নরদেহ ধারণ করিয়াও অমর সুরগণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, * সেই বর্ণভেদের প্রতি বিপ্রগণের যে মজ্জাগত আসক্তি থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত শূদ্র বা অব্রাহ্মণ হিন্দুদিগের মধ্যে যে কোনও কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বর্ণভেদ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রাচীনকালে জেতৃব্রাহ্মণগণ জিত শূদ্রদিগকে সমুদয় অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগের পায় দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছিলেন, ইংরাজ শাসনে, ইংরাজি শিক্ষায়, সেই শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। শূদ্রগণ সাধ করিয়া

---

* ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ। (পরাশর)

আবার সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের পদসেবা করিবার জন্য যথার্থই কি লালায়িত হইয়াছেন ? ইহার উত্তর বর্ণভেদ-পক্ষপাতী শূদ্রগণই দিতে সমর্থ। সে যাহা হউক, এখন বর্ণ-ভেদের দোষ গুণ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

অনেকে বলিয়া থাকেন "জাতিভেদ স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়।" ভূদেব বাবু এই কথার উত্তর অতি সংক্ষেপে দিতে চাহেন। তিনি বলেন—"যাহা নাই, তাহার অস্বীকারে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তদ্ভিন্ন সম্পূর্ণ সাম্য প্রভাবে বশ্যতা লোপ এবং বশ্যতার সম্মিলন একবারে অসম্ভবপর হয়" (পৃঃ ২৩৭) এই উত্তরে আমার আপত্তি আছে। "পৃথিবীতে সাম্য নাই" ইহার দুই অর্থ হইতে পারে। (১) এক অর্থ, পৃথিবীতে পূর্ণসাম্য নাই অর্থাৎ সাম্য কতক আছে (২) অপর অর্থ, পৃথিবীতে অপূর্ণসাম্য নাই। অর্থাৎ সাম্যের লেশমাত্র নাই। ১ম অর্থ অর্থাৎ "পৃথিবীতে (পূর্ণ) সাম্য নাই" এই অর্থ ধরিলে, তাহার উত্তর এই যে, পৃথিবীতে পূর্ণ সাম্য আছে এমন স্পষ্ট অসঙ্গত কথা কেহ বলেন নাই। যাহা কেহ বলেন নাই, তাহার প্রতিবাদ নিরর্থক। ২য় অর্থ, অর্থাৎ "পৃথিবীতে অপূর্ণ সাম্য বা সাম্যের লেশমাত্র নাই," এ অর্থ ধরিলেও, ভূদেববাবুর কথাটী স্বতঃই অসিদ্ধ, বুঝা যায়। যাহা হউক, জাতিভেদ যে সাম্যের বিরোধী, তাহা ভূদেব বাবু সাহস পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র বাবু এই স্বতঃসিদ্ধ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। হিন্দুত্বের প্রতি তাঁহার ভক্তি এমনি প্রগাঢ় যে, হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু আছে, তাঁহার চোখে সবই ভাল, সবই নিখুঁত। হিন্দু ধর্ম্মকে তিনি প্রেমিকের

চক্ষে দেখিয়াছেন। তাই তিনি দার্শনিক হইয়াও তাহা দার্শনিক-নেত্রে দেখেন নাই। প্রেমিকের নিকট প্রণয়িনী জগতে সকলের অপেক্ষা সুন্দর, বিধাতার ললামভূতা নিরুপমা সৃষ্টি। অন্যের চক্ষে যাহা খুঁত, প্রেম-রঞ্জিত-চক্ষে তাহা সৌন্দর্য্যের লীলা, মধুরতার তরঙ্গভঙ্গ। তাই, চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট, হিন্দুর জাতিভেদ, সাম্যের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, সাম্যের অনুকূল ও পোষক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

চন্দ্রবাবুর সাম্য-ব্যাখ্যা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'সাম্য' শব্দটার অর্থ কি, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমাদিগের আলোচ্য 'সাম্য' সম্বন্ধে দুই অর্থ হইতে পারে। (১) সাম্যের এক অর্থ—যাহার যেরূপ যোগ্যতা বা গুণ, তাহাকে তেমনি অধিকার দেওয়া, বা সম্মান করা। যথা ধার্ম্মিককে যথোচিত ভক্তি করা, জ্ঞানীকে সম্মান করা। এই অর্থে ইংলণ্ডে সাম্য নাই, মার্কিনে সাম্য নাই, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভিতর সাম্য নাই। মার্কিনে, ধনী ও নির্ধনের ভিতর যে ঘোর বৈষম্য, almighty dollar এর যে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি আছে, তাহা মহাত্মা ডিকেন্স মার্টিন চিজিলুয়িট নামক উপন্যাসে তাঁহার ব্যঙ্গ-ছুরিকায় ছেদন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে, মার্কিনের অপেক্ষা বেশী বই কম বৈষম্য নহে। মার্কিনে ধনজনিত এক বৈষম্য; ইংলণ্ডে ধন ও উপাধিজনিত দ্বিবিধ বৈষম্য। হিন্দু সমাজে বৈষম্য বর্ণভেদজনিত। শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের সমান গুণ থাকিলেও শূদ্র ব্রাহ্মণের সমান অধিকার পান না। (২) সাম্যের আর এক অর্থ—যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমভাবে অবাধে নিজের শক্তি, বুদ্ধি ও চেষ্টানুসারে ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ইত্যাদি লাভ করিবার

সমান সুবিধা পাইতে পারে, সমাজের এরূপ অবস্থা। এই অর্থে মার্কিনে যে সাম্য পরিলক্ষিত হয় হিন্দু সমাজে তাহা নাই। হিন্দু সমাজে ধনে ও শাস্ত্রজ্ঞানে শূদ্রের অধিকার নাই বলিলেই হয়। সুতরাং ১ম ও ২য় দুই অর্থেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বৈষম্য। প্রথমতঃ, কোনও শূদ্র গুণে ব্রাহ্মণের সমতুল্য হইলেও সমান অধিকার বা সম্মান পান না। দ্বিতীয়তঃ শূদ্র সমান গুণ বা ধন বা জ্ঞান ইত্যাদি লাভকরণপক্ষে ব্রাহ্মণের সমান সুবিধা পান না। ইহাও যদি বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে জগতে কুত্রাপি বৈষম্য নাই। তথাপি চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "বর্ণভেদ প্রথার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অসদ্ভাব লক্ষিত হইবে না।" অর্থাৎ এই বর্ণভেদে সমত্ব আছে, বৈষম্য নাই। তাহার যুক্তি;—লোকের ক্ষমতার প্রকৃতি ও পরিণাম ভেদে তাহাদের কর্ম্মও বিভিন্ন হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে তাহাদের পদও বিভিন্ন এবং সমাজের সম্মান ইত্যাদির কম বেশী হইয়া থাকে। কর্ম্ম, পদ, এবং সম্মান ইত্যাদির বিভিন্নতা প্রকৃত সাম্য।* এই যুক্তি সম্বন্ধে এই আপত্তি রহিয়াছে যে, শূদ্রের ক্ষমতা ও প্রকৃতি ব্রাহ্মণের তুল্য হইলেও, শূদ্র "বর্ণভেদ প্রথার নিগূঢ় তত্ত্বের" প্রভাবে, তুল্য সম্মান পান না।

পার্থিব অধিকার সম্বন্ধে শূদ্র ও ব্রাহ্মণের ভিতর যে বৈষম্য আছে, তাহা চন্দ্রনাথ বাবুকে স্বীকার করিতে হইবেই। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু এই পার্থিব অধিকারবৈষম্য, আধ্যাত্মিকতার সমত্ব মিশ্রণে, সমীকৃত করিতে চাহেন। তাঁহার যুক্তি—এক সমত্বময় ব্রহ্ম-পদার্থ লইয়া আধ্যাত্মিকতা, অতএব যেখানে পার্থিবতার

* হিন্দুত্ব পৃঃ ৩১৪।

পরিহার এবং আধ্যাত্মিকতার আদর, সেখানে কি ব্যক্তি-গত, কি সমাজগত সকল প্রকার সমত্বের বৃদ্ধি এবং বৈষম্যের বিনাশ। অর্থাৎ হিন্দুসমাজে আধ্যাত্মিকতা অধিক, আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মমূলক, ব্রহ্ম সমত্বময় পদার্থ, সুতরাং হিন্দু সমাজে সমত্ব অধিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বৈষম্য নাই। এই যুক্তির তাৎপর্য্য ভাল বুঝিলাম না। প্রথমতঃ ব্রহ্ম সমত্বময় ইহার অর্থও অতিশয় অস্পষ্ট, দ্বিতীয়তঃ সমত্ব অধিক হইয়াও তাহা উচ্চ তিন বর্ণে আবদ্ধ থাকিতে পারে, শূদ্রবর্ণ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে না পারে।

ইদানীং মার্কিনদিগের মধ্যে ক্রীতদাসগণ ইহার দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আমরা কোন জাতির উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে অধিকার, স্বত্ব, সাম্য প্রভৃতি সৌভাগ্য দেখিতে পাই, সমুদয় সমাজে অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও তাহা ব্যাপ্ত, সহসা এই অনুমান করিয়া লইয়া ভ্রমে পতিত হই। পেরিক্লিসের সময় যখন এথেন্‌স নগরী সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তখনও তাহার দাসগণের সংখ্যা, স্বাধীন আথিনিয়ানগণের সংখ্যার অপেক্ষা, অনেক অধিক। যখন বলি, এই সময় এথেন্স নগর সুখ ও সাম্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন হতভাগ্য দাসগণের দুরবস্থা স্মরণ রাখি না। যখন বলি, প্রাচীন ভারত, সুখ সাম্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন হতভাগ্য বিজিত শূদ্রদাসগণের শোচনীয় দশা বিস্মৃতির অন্তরালে রাখিয়া দিই।

তাই চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন—"বর্ণভেদ অনুসারে যে পার্থিব অধিকারভেদ আছে, তাহাকে কিছুতেই বর্ণ মধ্যে বৈষম্যের কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, সে সকল অধিকার

বর্ণগুলিকে আপন আপন সুখ, সমৃদ্ধি এবং ভোগের নিমিত্ত দেওয়া হয় নাই, কেন না পার্থিবতা ও পরিহার সকল বর্ণেরই সমান উদ্দেশ্য। অতএব সম্ভব এই যে, সমস্ত সমাজের রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত সে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে।" (হিন্দুত্ব পৃঃ ৩৩২) এখানে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, চন্দ্র বাবু তাহা পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। জাতিভেদে "সমস্ত সমাজের" মঙ্গল সমভাবে রক্ষিত হয়, এই কথা চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিপক্ষের লোকেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দ্বিজগণের পার্থিব মঙ্গলের জন্য জাতিভেদ প্রথা দ্বারা শূদ্রগণের মঙ্গল খর্ব্ব করা হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে স্বীকার করিয়াছেন "মূর্খ শূদ্র দাসত্বে আবদ্ধ এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ।" (পৃঃ ৩৩১) মূর্খতা, দাসত্ব বন্ধন, শাস্ত্রাধ্যয়নে অনধিকার, এইগুলি যে জ্ঞান, স্বাধীনতা, শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারের ন্যায় সমান মঙ্গলজনক, এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করিতে না পারিলে জাতিভেদে শূদ্র ও ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে, অথবা "সমস্ত সমাজের (সমান) রক্ষা ও মঙ্গলের নিমিত্ত (ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে অসমান) অধিকার দেওয়া হইয়াছে" এই বোধাতীত কথা কেমন করিয়া মানিব ?

মার্কিন পণ্ডিত জন্সন বলেন—"The theoretic aim of the Manovashastra is the utter suppression of selfish desire."

এই কথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে আমি স্বীকার করি। কিন্তু শূদ্রগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যে "Utter suppression of selfish desire"

চরম-স্বার্থ ত্যাগ প্রকাশ করিয়াছেন,এই কথা কেমন করিয়া স্বীকার করি ?

বর্ণভেদের মূল ও হেতু।

যতদূর বুঝিয়াছি,জাতিভেদ সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর মত এই যে মৌলিক বর্ণ-ভেদ অর্থাৎ মৌলিক কুলভেদ হইতে আকার ও প্রকৃতির পার্থক্য হইয়াছে। আকার ও প্রকৃতির প্রার্থক্য হইতে ব্যবসার ভেদ হইয়াছে। * এবং ব্যবসার ভেদ হইতে জাতিভেদ হইয়াছে সুতরাং জাতিভেদ ত্রিবিধ ভেদমূলক (১) কুলভেদ, (২) আকার ও প্রকৃতিভেদ (৩) ব্যবসায়ভেদ। জাতিভেদ এই ত্রিবিধ পার্থক্যজাত, তাই ভূদেববাবু বলেন "ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং দৃঢ়; এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধ-চেষ্টা বিফল হইয়া যায়"। ভূদেব বাবুর এই ব্যাখ্যাতে জাতিভেদ-মূলের গভীরতা ও দৃঢ়তার সম্যক্ কারণ দেখা যাইল না। ভারতবর্ষের জাতিভেদে যে বিশেষত্ব আছে, ভূদেব বাবুর ব্যাখ্যাতে তাহার হেতুনির্ণয় হয় নাই ; কেন না, মৌলিক বর্ণ-ভেদ তাহার প্রধান কারণ নহে। মৌলিক বর্ণভেদ, অন্য অনেক দেশেও আছে। ইংলণ্ডে গ্রীসে ইতালিতে ও মিসরে কত মৌলিক বর্ণ কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি সমাগত ; কিন্তু কৈ, তাহাতে ত সেখানে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইলনা। যদি ইংলণ্ডের বা নব্য ইতালিতে, মিসরের বা নব্য গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মৌলিক ভেদের বহুত্বের প্রচুরতা সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে, তাহা হইলে না হয় তাহা ছাড়িয়া-

* ভূদেব বাবুর সামাজিক প্রবন্ধ পৃঃ ২৩৮।

দিন; কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে, ইংরাজ হইতে নিগ্রো পর্য্যন্ত, কতদেশের কতজাতি একত্রিত হইতেছে, কত ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক বর্ণ তথায় মিশ্রিত হইতেছে। তাহাদের বিবিধ আকারের ও প্রকৃতির কত পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি সেখানে ভারতবর্ষের ন্যায় জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত হইল না কেন? সেখানে "সঙ্করো নরকায়ৈব," বর্ণসঙ্কর নরকের নিমিত্তই হয় এ মত প্রচারিত ও গৃহীত হইল না কেন? সেখানে, যাহারা মোটেই সমবর্ণ এবং সমাকার নহে, তাহাদের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে কেন?

হিন্দুদিগের জাতিভেদ কেবল মৌলিক বর্ণভেদের উপর স্থাপিত নহে। এই মৌলিক বর্ণভেদের সঙ্গে জেতৃজিতভেদ অর্থাৎ রাজনৈতিক ভেদ মিলিত হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক ভেদের উদ্দেশ্য জেতৃগণের অর্থাৎ দ্বিজগণের প্রভুত্ব রক্ষাকরা। সেই রাজনৈতিক ভেদ পোষণ করিবার জন্য সামাজিক-ভেদ অর্থাৎ ব্যবসায়-ভেদ ও বিবাহ-ভেদ বিধান করিতে হইয়াছিল। এবং এই সামাজিক ভেদ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান স্থাপিত করিবার জন্য, ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের ভিতর স্বার্থ প্রবেশ করাইলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব, অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মিস্ত্রিগণ, কর্ণিক হাতে করিলেন; ব্যবস্থার উপর ব্যবস্থার ইষ্টক দিয়া অতি কৌশলময় মসলায় প্রাচীর গাঁথিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের পর দুর্ভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিলেন। কেবল প্রাচীর গাঁথিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এই সকল প্রাচীর যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকল বর্ণের হিতার্থে নির্ম্মিত

হইয়াছে তাহা "শিক্ষা" দ্বারা ক্রমাগত প্রচার করিতে লাগিলেন।

এখন জেতা ইংরাজগণ,জিত ভারতবাসীগণের উপর, কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিতে ক্ষান্ত আছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের উপর কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্ব করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। ব্রাহ্মণগণ রাজনৈতিক প্রভুত্বকে এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রভুত্বে বিকশিত ও পরিণত করিয়া সেই প্রভুত্ব সর্ব্বাঙ্গীন ও অসীম করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যখন স্বার্থের জন্য কোনও কার্য্য করেন, তাঁহারাও তখন বলেন যে, সকলের হিতের জন্য, ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলেরই মঙ্গলের জন্য, তাহা করিতেছেন। কিন্তু সেই সব কথা আমরা সকল সময় বিশ্বাস করি না। কেন না ইংরাজেরা আজিও উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দেন নাই, এখনও আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু নষ্ট করিয়া, অন্ধ-বিশ্বাসের কূপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করেন নাই। আমাদিগের ধনসম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে বটে; কিন্তু আমাদিগের মস্তিষ্ক, আমাদিগের বিচার-শক্তি, এখনও একবারে ইংরাজদিগের অধীন হয় নাই। তাই, ইংরাজ যাহাই বলেন, আমরা তাহাই বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ প্রথম হইতেই শূদ্রদিগের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া দিয়া, শূদ্রদিগের মস্তিষ্ককে আপনাদিগের মুষ্টির মধ্যে আনিয়াছিলেন। এই জন্য ব্রাহ্মণগণ যাহা বুঝাইলেন, অজ্ঞ শূদ্রগণ তাহাই বুঝিল, তাহাই মানিল।

এখন আমরা দেখিলাম, হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথা, চতুষ্টয় ভেদের উপর স্থাপিত; (১) বর্ণ বা বংশভেদ, (১) রাজনৈতিক

ভেদ; (জেতা ও জিতের মধ্যে যে প্রভেদ); (৩) সামাজিক ভেদ (ব্যবসায় ভেদ ও বিবাহ ভেদ) (৪) ধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম ভেদ (যথা দ্বিজদিগের সেবাই শূদ্রদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল)। হিন্দুদিগের জাতিভেদের বিশেষত্ব এই যে, অন্য দেশে যে মৌলিক শ্রেণীভেদ, কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত থাকে, হিন্দুগণ তাহা তাহাদিগের বিশাল ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়া, এই প্রথাটীকে বিচিত্রভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন; তাই হিন্দুদিগের জাতিভেদের এত দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা।

জাতিভেদের মূল।

প্রকৃত পক্ষে জাতিভেদ প্রথার সহিত ধর্ম্মের দৃঢ়বন্ধনই হিন্দুজাতিভেদ প্রথার বিশেষত্ব। কোন না কোনও ভাবে সকল দেশেই চিরকাল জাতিভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু অন্য দেশে জাতিভেদের সহিত ধর্ম্মের যোজনা নাই। হিন্দুদিগের ভিতরে তাহা আছে। হিন্দু জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের বজ্রবন্ধনীতে রক্ষিত। এমন কি জাতিভেদই যেন হিন্দুধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহীশূরের "আদম সুমারিতে" শ্রীযুক্ত নরসিম্মিয়েঙ্গারও (Narasimmiyengar) ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন;—

"A kind of social caste exists all over the world and is almost co-eval with human existence, but in other countries and natives, it is of the earth, earthy, neither sanctioned, nor demanded by religi-

on. * * * In India however caste is quasi-religious, and it has acquired such an ascendency over all sections of the people as to supplant religion." আমি জাতিভেদ সম্বন্ধে এতদূর যাহা লিখিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ভূদেব বাবুর অন্যান্য যুক্তি আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র। তবে ভূদেব বাবু জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার লেখনী হইতে যে কথা নিঃসৃত হয়, তাহা বিশেষ আলোচ্য। তজ্জন্য আমি তাঁহার আরও দুই একটী যুক্তি আলোচনা করিব।

তিনি বলেন :—"যেমন গঙ্গাতে আসিয়া পড়িলে সকল নদ নদীর জল গঙ্গাজল হইয়া যায়, তেমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে'—বুদ্ধদেবের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না,সকল জাতির লোককে তুল্যমূল্য করিলেন, এবং সেইজন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণাত্মক লোকের বাস, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং বদ্ধমূলতা লাভ করিল''। (সামাজিক প্রবন্ধ পৃঃ ২৩১)

পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই যুক্তির অর্থ, এই, কৌলিকবর্ণভেদযুক্ত ভারতে জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্ম্ম সফল হইল না, কিন্তু মৌলিকবর্ণভেদহীন (এক বর্ণাত্মক) ব্রহ্ম,চীন, তিব্বতে জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্ম্ম সফল হইল। অতএব ভারতে মৌলিকবর্ণভেদই জাতিভেদহীন বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্ফলতার কারণ, অর্থাৎ

ভারতে মৌলিক বর্ণভেদ আছে বলিয়া জাতিভেদ থাকিবে। এই যুক্তিতে প্রমাদ ঘটিয়াছে, একটী সহজ উদাহরণ দ্বারা তাহা দেখাইতেছি। হরি কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কুইনাইন দেওয়ায় জ্বর বন্ধ হইলনা। যদু গৌরবর্ণ,তাহাকে কুইনাইন দেওয়ায় জ্বর বন্ধ হইল। অতএব কৃষ্ণ বর্ণ লোকের উপর কুইনাইন খাটে না, গৌরবর্ণ লোকের উপর কুইনাইন খাটে। এ যুক্তি যেরূপ, ভূদেব বাবুর উল্লিখিত যুক্তি সেইরূপ নহে কি? আমরা জানি, বর্ণের সহিত কুইনাইনের ফলাফলের কোনও সম্বন্ধ নাই। হয়ত হরির লিভার খারাপ হইয়াছে অথবা দেহের অন্য কোন যন্ত্র এককালে বিকৃত হইয়াছে, তজ্জন্যই খাটিল না। সেইরূপ হিন্দু-সমাজের দেহের কোন যন্ত্র হয় ত বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে জাতিসাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম সফল হইতে পারিল না। (১) ভারতে মৌলিকবর্ণভেদ আছে, জাতিভেদ আছে। (২) তিব্বতে মৌলিক বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদও নাই। অতএব মৌলিক বর্ণভেদ জাতিভেদের কারণ। এই যুক্তিতে হঠাৎ চটক লাগিতে পারে। হঠাৎ যেন বোধ হয়, এই যুক্তির প্রথম ভাগে মৌলিক বর্ণের সহিত জাতিভেদের নিত্য অন্বয় প্রদর্শিত হইল এবং দ্বিতীয়ভাগে, মৌলিক বর্ণভেদের ব্যতিরেকে জাতিভেদের নিত্য ব্যতিরেক দেখান হইল। অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা যেন ভূদেব বাবু মনে করিয়াছেন, মৌলিক বর্ণভেদ এবং জাতিভেদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইল। কিন্তু একটীমাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা, কার্য্যকারণভূত অচ্ছেদ্য অন্বয় প্রমাণ হয় না, একাধিক বা অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। "Mill" তাঁহার তর্কশাস্ত্রে যে প্রমাণ-প্রণালীকে Method of Agreement বলিয়াছেন,

তাহাকে অন্বয়মূলক প্রমাণ বলা যাইতে পারে তাহার লক্ষণ—"If two or more instances of the phenomenon under investigation (এখানে জাতিভেদ) have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree (এখানে ভূদেব বাবু বলিতে চাহেন, মৌলিক-বর্ণভেদ) is the cause (or effect) of the given phenomenon" Mill's Logic. (V. I. P.422)

ভূদেব বাবুর অন্বয়মূলক দৃষ্টান্তে কেবল ভারতের জাতিভেদ স্বরূপ একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। আর কোনও দেশে মৌলিক বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে,তাহা দেখান হয় নাই। বরঞ্চ আমি তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি,যথা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ (United States) প্রদেশে, মৌলিক বর্ণভেদ সত্তেও (ভারতবর্ষের) জাতিভেদ নাই। ভূদেব বাবুর যুক্তিতে Method of Agreement প্রয়োগ পক্ষে অন্যান্য আপত্তি আছে। কিন্তু সে কথা যাউক। তাহার পর ভূদেব বাবুর যুক্তির (২) ভাগ অর্থাৎ তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে মৌলিক বর্ণভেদ নাই, জাতিভেদও নাই,ইহাকে ব্যতিরেক যুক্তি বলিয়াছি। Mill যাহাকে Method of difference বলিয়াছেন, বোধ হয় ইহা তাহারই কল্পিত ছায়া। কিন্তু Method of difference এর লক্ষণ কি, দেখুন—"If an intance (ভারত-বর্ষ) in which the phenomenon under investigation (এখানে জাতিভেদ) occurs and an instance (এখানে তিব্বৎদেশ) in which it (এখানে জাতিভেদ)does not occur,

have every circumstance in common, save one, that one occurring only in the former (ভারতবর্ষ); the circumstance in which alone the two instances differ (এখানে মৌলিক বর্ণভেদ), is the effect, or the cause, or a necessary part of the cause of the phenomenon" —Vol I. p. 423.

এখন এই Method of difference প্রয়োগে ভূদেব বাবুর যুক্তিতে মূলে প্রমাদ ঘটিয়াছে। কারণ, এই যুক্তি প্রণালীতে, দুইটী দৃষ্টান্তে, একটী ভিন্ন অন্য সমুদয় অবস্থা সদৃশ হওয়া চাহি। কিন্তু ভারত ও তিব্বতে মৌলিক বর্ণভেদগত বিভিন্নতা ব্যতীত অন্য নানাবিধ অবস্থার তারতম্য আছে। Method of difference বা ব্যতিরেক যুক্তি-প্রণালী কিরূপ সহজে প্রমাণ হয়, তাহা দেখাইতেছি; পক্ষী বাঁচিয়া আছে, তাহাকে কার্বলিক এসিড্ গ্যাসে নিক্ষেপ কর, সে মরিবে। এখানে আর সমুদয় অবস্থা এক বা সদৃশ। কেবল বায়ু না হইয়া কার্বলিক এসিড্ গ্যাস এই তারতম্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই গ্যাসে যে পক্ষীর মৃত্যু হইল, এই সিদ্ধান্ত প্রশস্ত।

আর এক কথা। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক যুক্তি প্রণালী অর্থাৎ Method of Agreement and Method of difference অথবা মিল (Mill) যাহাকে Joint method of Agreement and Difference * বলিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া সামা-

* The following is the canon of the Joint method of Agreement and Difference :—

"If two or more instances in which the phenomenon occurs have only one circumstance in common while two or more instances in which it does not occur have nothing in common, save the absence of that circumstance, the circumstance in which alone the two sets of instances differ, is the effect, or the cause or a necessary part of the cause, of the Phenomenon. Vol I. P. 429.

জিক প্রশ্ন মীমাংসা করিতে যাইলে, প্রায়ই বিষম প্রমাদে পতিত হইতে হয়। কারণ,সমাজতত্বে প্রমাণের উপকরণ গুলি ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করা যায় না। তাই সমাজতত্বে একটী কোনও ঘটনার কারণ সহজে স্থির হয় না। নানা জন নানা কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের কারণ সম্বন্ধে ভূদেব বাবু এক কথা বলেন, রমেশ বাবু আর এক কথা বলেন। ভূদেব বাবু বলেন যে, মৌলিকবর্ণভেদযুক্ত ভারত-সমাজে, জাতিসাম্য প্রয়োগ করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নিষ্কাসিত হইল। রমেশ বাবু বলেন :—

Budhism gradually declined during the centuries after the Christian era, much in the same way as the Hinduism of the Rig Veda had gradually become corrupted in the Epic Period when the Hindus had settled down in the Gangetic valley. Buddhist monks formed a vast and unmanageable body of idle priesthood owning vast acres of land attached to each monastery and feeding on the resources of the people and Buddhist ceremonials and forms bordered more and more on Buddha-worship and idolatry.(R. C. Dutt) Ancient India People's Edit, Introduction. P. 17.)

ভূদেব বাবুর প্রদর্শিত যুক্তিটী যে নিতান্ত অমূলক,স্বকপোলকল্পিত, তাহা আমি বিস্তৃতভাবে দেখাইলাম। সামান্য লেখকের যুক্তি সমালোচনা করিতে হইলে, যে স্থলে এক কথায় সারিতাম, ভূদেব বাবু বলিয়া সে স্থলে কয়েক পাতা লিখিতে হইল।

তৎপরে তাঁহার আর একটী যুক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ভূদেব বাবু বলেন "জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর একটী কথা বলা হয়। এই কথাটী ঐতিহাসিক পরিণামবাদ

হইতে সমুদ্ভূত। কথাটী এই—"কোনও সময়ে, ইউরোপীয় সকল সমাজেই এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে ঐ প্রথার কিছু কিঁছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামবাসীদিগের পুত্রেরা স্ব স্ব পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করে। এবং সমব্যবসায়ীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এখন এই প্রথা কোনও বৃহন্নগর বা দেশ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব সমাজ যে পরিণতি নিয়মের অধীন, সে নিয়ম জাতিভেদ প্রথার অনুকূল নহে—এইজন্য উহা এখন পৃথিবীতে অসাময়িক হইয়াছে এবং উৎসারিত হওয়া উচিত। এই কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, জাতিভেদ প্রথা যদি অন্যান্য দেশের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় কেবলমাত্র শ্রমবিভাগের প্রয়োজনে সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের ঐ প্রথার পরিণতি তদনুরূপ হইত। উহা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত"। (সাঃ প্রঃ ২৩৬ পৃঃ)

ভূদেব বাবুর এই যুক্তি এই কথার উপর স্থাপিত যে,—যাহার প্রয়োজন নাই,তাহা আপনা হইতে উঠিয়া যায়। প্রয়োজন অর্থে (১) উপযোগিতা হইতে পারে। উপযোগিতা অর্থে কি ? যাহা অবস্থাবিশেষে তিষ্ঠিতে সমর্থ, তাহা সেই অবস্থার উপযোগী ; এবং যাহা অবস্থাবিশেষে তিষ্ঠিতে পারে না, অর্থাৎ "আপনা হইতে চলিয়া যায়" তাহা সেই অবস্থার উপযোগী নহে। অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন নাই। ভূদেব বাবুর কথাটী এখন কি আকারে পরিণত হইল, দেখুন ; যাহার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ যাহা আপনা হইতে চলিয়া যায়, তাহা আপনা হইতেই চলিয়া যায়।

এই কথার কোনও সার্থকতা নাই। প্রয়োজন অর্থে (২) উপকারিতা হইতে পারে। এই অর্থে ভূদেব বাবুর কথা দাঁড়ায় যে, যে প্রথার প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ যে প্রথার উপকারিতা (সুখদায়িতা) নাই, তাহা আপনা হইতে উঠিয়া যায়। এ কথার একটা মস্ত হঠোক্তি রহিয়াছে, যাহা প্রমাণসাধ্য তাহা বিনা প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কে বলিল যে, যখন প্রথার উপকারিতা নাই, তখন তাহা আপনা হইতেই উঠিয়া যায়। আপনা হইতে উঠিয়া যায় না, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যদি উপকারিতা-লুপ্ত প্রথা সকল আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে সমাজ-সংস্কার বা ধর্ম্ম-সংস্কার, আইন-সংস্কার বা চিকিৎসা-সংস্কারের চেষ্টার প্রয়োজন হইত না। তাহা হইলে সমাজের মঙ্গলের জন্য কোনও প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রচারকের অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইত না। সকলেই সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইলে বেশ হইত। কোনও প্রথা সম্বন্ধে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করার আবশ্যক হইত না; উপকারিতা-বিযুক্ত-প্রথা সকল 'আপনা হইতে উঠিয়া যাইত।' ভূদেব বাবুর মতে এখন হইতে কোনও সংস্কারক আর বলিতে পাইবেন না যে, "এই প্রথা নিষ্প্রয়োজন, ইহার উপকারিতা নাই, অতএব ইহা উঠিয়া যাওয়া উচিত"। কেন না ভূদেব বাবু বলিতেছেন 'যদি প্রথা নিষ্প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত'।

কোনও প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকিয়া সমাজ-হৃদয়ে শিকড় নামাইলে, তাহার উপকারিতা চলিয়া যাইলেও, তাহা অসাময়িক হইলেও তাহা অনেক স্থলেই "আপনা হইতে উঠেনা"

দীর্ঘকালে সেই প্রথা কেমন জমাট বাঁধিয়া যায় যে, তাহা পরিবর্ত্তন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। এবিষয় Bagehot তাঁহার Physics and Politics নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বিস্তৃত ও বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে প্রথা মানুষকে সভ্য করে, সমাজকে উন্নত করে, সেই প্রথাই আবার অনেক স্থলে কালক্রমে অনমনীয় বা কঠিন হইয়া উঠে। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে তখন আর তাহাকে পরিবর্ত্তিত বা নিষ্কাসিত করা যায় না। তখন প্রথা বা দেশাচার, যুক্তি বিচারের অতীত হইয়া উঠে। এবং এই সময়েই সভ্যতার অবনতি, সমাজের অমঙ্গলের আরম্ভ হয়। তিনি বলেন, যুক্তি বিরুদ্ধ দেশাচারবশ্যতাই সমাজের অনিষ্টের মূল, সভ্যতা পতনের কারণ।

যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাচীন প্রথা বা দেশাচার বা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিলে যে সমাজের অমঙ্গল হয়, প্রকৃত ধর্ম্মের হানি হয়, সভ্যতার পতন হয়, তাহা যে কেবল ম্লেচ্ছ Bagehot বলিতেছে তাহা নহে, তাহা ভগবান্ বৃহস্পতিও বলিতেছেন :—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে" ॥ এই যুক্তিহীন বিচার আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, গৌরবময় সভ্যতা হইতে আমাদিগকে হেয় দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করিয়াছে।

যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাতে লোকের কেমন একটা অচলা ভক্তি জন্মিয়া যায়। তাহা, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। অনেকে মনে করেন, এতদিন যে প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেও

যেমন সমাজের উপযোগী,এখনও সমাজের পক্ষে তেমনি উপযোগী। অর্থাৎ এখন তাহা সমাজের পক্ষে অনুপযোগী হইয়াছে, তাহা কখন হইতে পারে না। তাহাদের যুক্তিটী এইরূপ—"এই বাটীটী যখন একশত বৎসর পড়ে নাই, তখন ইহা এখনও পড়িতে পারে না"। আমি ব্যঙ্গ করিতেছি না, সাধারণ লোক যথার্থই"এই রূপ যুক্তিতে চালিত হয়। উদাহরণ স্থলে আমি এখানে একটী বাস্তবিক ঘটনা বলিতেছি। কতিপয় বৎসর হইল, এই দেশে কোনও স্থানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকা অতিশয় প্রাচান, সম্ভবতঃ ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড ছাদের একদিক পড়িব পড়িব হওয়াতে, সেইখানের আড়ায় একটী দীর্ঘ বাতি শালকাষ্ঠ দিয়া ঠেকো-দিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক বৎসর এই অবস্থায় ছিল। ক্রমে, বোধ হইল, এই খুঁটিতে ছাদ রাখিতে পারিবে না, কোন দিন ছাদ বিকট শব্দ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। কোন পর্ব্বোপলক্ষে প্রতিবৎসর ঐ ছাদের নীচে লোকারণ্য হইত। এবং সেই দিন ঐ ছাদের নিকট তোপধ্বনি হইত। আমার ভয় হইল, যদি ঐ দিনে ছাদ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অনেক গুলি লোকের প্রাণ যাইবে। তজ্জন্য যাহাতে ঐ স্থানে জনতা না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেকে বলিলেন "মহাশয়, আমরা বহুকাল ছাদের ঐ থানটা ঐ রূপ খুঁটি লাগান দেখিতেছি। এত দিন যখন উহা পড়ে নাই, এই বৎসরই কি উহা পড়িবে? তাহা কখন হইতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও ভয় নাই। অধিকন্তু এখানে লোক না আসিলে ধর্ম্মহানি হইবে।"

আমি উত্তর করিলাম ;—

"অধিক কাল ঐ রূপ জীর্ণাবস্থায় আছে বলিয়াই, ঐ বাটী এখন পড়িয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা। ইহা সহজ কথা, জীর্ণ ছাদ কালাতিপাতে দৃঢ় হয় না ; আরও জীর্ণ হয়। আর পতনোন্মুখ ছাদের নীচে লোকসমাগম নিবারণ করাতে ধর্ম্মহানি হইতে পারে না ; ধর্ম্মপালন করা হয়"।

কিন্তু আমার কথা কে শুনে। যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ সেই অট্টালিকার ছাদ পর্ব্ব দিনের পূর্ব্বেই একদিন, ঘোর শব্দে সুদূরস্থ স্থান প্রতিধ্বনিত করিয়া ভূমিসাৎ হইল। তখন সেখানে গিয়া দেখি, প্রাচীনতাপ্রিয় তার্কিকগণ নীরবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিছু দিন পরে সেই অট্টালিকার সংস্কার বা পুনর্নির্ম্মাণ হইল।

সামাজিক প্রথার ছাদও যখন ঐ রকম জীর্ণ হয়, তখন ঐ প্রথা প্রাচীন বলিয়া, অনেকে মিথ্যা সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। কিন্তু এইরূপ জীর্ণ প্রথার নীচে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা মহাবিপদজনক। চিরকাল ঠেকো দিয়া পতনোন্মুখ প্রথাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার সংস্কার বা পুনর্নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। একদিকে যেমন না বুঝিয়া, একদিক হইতে সটান পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা ভাল নহে ; অন্য দিকে তেমনি, বিচার না করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া, অথবা কেবল মাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রাচীন সামাজিক প্রথা মাত্রকেই অক্ষুণ্ণ বা অপরিবর্ত্তিত রাখিবার প্রয়াসও প্রমাদজনক। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভুলিবেন না ;—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ''।

মনে রাখিবেন—

"যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়ন্তে''।

কেবলমাত্র প্রাচীন কথার বশীভূত অথবা কেবলমাত্র শাস্ত্রের বচনের উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ও অসাময়িক জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না। আমাদিগের জাতি-ভেদের ভিতর যাহা সার ছিল, তাহা গিয়াছে। জাতিভেদের প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে,এখন আছে জাতিভেদের মৃতদেহ। সেই মৃতদেহ এখন পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে। বিষময় বাষ্প উদ্গীরণ করিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। সত্য, পুত্রের মৃত্যু হইলে জননী তাহার মৃতদেহ ছাড়িতে চাহেন না। সেই মৃত-দেহকেও কোলে করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু কতক্ষণ তিনি সেই মৃত দেহকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিতে পারেন? সেই প্রাণা-ধিক প্রিয়পুত্রের দেহ অবশেষে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়।

সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাদেব তথাপি মায়াতে বিভোর হইয়া, সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতের হিতের জন্য, নারায়ণের সুদর্শন চক্র নির্ম্মমভাবে সেই সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিল। আমাদিগের দেশে ভূদেব বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মা-গণ জাতিভেদের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, ইতিহাসের প্রাচীন গৌরবের সুখময় স্মৃতিতে বিভোর হইয়া মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এই সকল মহাত্মাগণকে আমি আন্তরিক ভক্তির সহিত নমস্কার করি। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এখন সুদর্শন চক্রের বড়ই প্রয়োজন।

প্রাচীন জাতিভেদের গুণ।

প্রাচীন জাতিভেদের মধ্যে যে অনেক পরিমাণে উদারতা, দয়া, মৈত্রী, সমাজজ্ঞতা ছিল, তাহা আমি স্বীকার করি। শূদ্র-গণ দাস ছিল বটে; কিন্তু দাসত্বের ভিতর রাখিয়া, শূদ্রগণের প্রতি যতদূর সদয় ব্যবহার করা যাইতে পারে, দাসের প্রতি যতদূর দয়াদাক্ষিণ্য দেখান যাইতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ একদিকে যেমন শূদ্রদিগের সম্পূর্ণ বশ্যভাবের বিধান করিয়াছিলেন, অন্তদিকে ব্রাহ্মণগণকে মৈত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-শাসনে শূদ্রজীবন পক্ষে, এই দয়ালালিত দাসত্ব নিতান্ত দুঃসহ হয় নাই। এমন কি, ইউরোপ ও মার্কিন দেশের সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর স্বাধীন দরিদ্রব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এই দাস শূদ্রগণের অবস্থা মন্দ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রকার-দিগের ব্যাবহারিক প্রজ্ঞার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমি, চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে মিলিয়া, বলিতে পারি না যে, জাতিভেদে বৈষম্য নাই। ভূদেব বাবুর কথায়ও স্বীকার করিতে পারি না যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ বর্ত্তমান আকারে সমাজের উপযোগী বা মঙ্গলজনক (সাঃ প্রঃ পৃঃ ২৪০)। হিন্দু-দিগের প্রাচীন জাতিভেদের যে সকল গুণ ছিল, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। পৃথিবীর সকল দেশেই ধনের দম্ভ ও প্রতাপ বড় অধিক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ধনের দুর্দ্ধর্ষ দম্ভকে অনেক পরিমাণে দমিত করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ সম্মানিত ও পূজিত হওয়ায়, শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্মানিত ও

পূজিত হইত। এখনকার Plutocracy ধনপ্রভুত্ব অপেক্ষা তখনকার Brahminocracy (ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব) হয়ত ভাল ছিল। প্রাচীনকালের জাতিভেদে সম্ভবতঃ এমন কোনও দোষ নাই, যাহা আধুনিক জাতিভেদশূন্য ইউরোপীয় সমাজে কোন না কোন আকারে অবস্থিত নাই। জাতিভেদ মানুষে মানুষে ব্যবধান করিয়া দেয় বটে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত আহার করিতে পারে না বটে, কিন্তু এখনও বিলাতে একজন লর্ড একজন ছোট লোকের সহিত আহার করেন না। জেতা ইংরাজ জিত ভারতবাসীর সহিত একত্রে আহার করিতে চাহেন না। ব্রাহ্মণ যতদূর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠভাবে শূদ্রের সহিত মিশিতেন, ইংরাজ ভারতবাসীর সহিত তত দূর আত্মীয় বা সমভাবে মিশেন না। শূদ্রদিগের দাসত্ব নিবন্ধন দুরবস্থা কখনই বিলাতের সোয়েটিং (Sweating) প্রণালীর অতিশ্রমী মজুরদিগের দুরবস্থার মত কষ্টজনক হয় নাই। এবং এখন স্বাধীন বেকার মজুরেরা ইউরোপে যেমন কষ্টভোগ করে, প্রাচীনকালে অধীন শূদ্রদাসগণ কখন বোধ হয় তেমন কষ্টভোগ করে নাই। এমন কি এখন, জাতিভেদ বন্ধনমুক্ত বাবুরা চাকরদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা জাতিভেদ মানিয়াও তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল ব্যবহার করিতেন। পূজ্যপাদ ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত প্রণেতা, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে—"সে কালের কর্ত্তারা জাতিভেদ মানিয়াও শূদ্র ভৃত্যগণকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত দাদা মামা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইতেন। শূদ্র ভৃত্যের শিশুসন্তানকে কোলে লইয়া আদর সোহাগ করিতেন। এ কালের বাবুরা

সখ করিয়া কুকুর কোলে লইবেন, কিন্তু ভৃত্যশিশুদিগকে কখন কোলে লইবেন না, যেন চাকরের শিশু সন্তান কুকুরের অপেক্ষাও ঘৃণার্হ ও অস্পৃশ্য।" কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও আধুনিক খ্রীষ্টিয়ান সমাজের ভিতর এই একটী প্রভেদ দেখিতে পাই:—প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যতদূর বৈষম্য দেখিতে পাই, সমাজে ততদূর বৈষম্য দেখিতে পাই না। আবার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মশাস্ত্রে যতদূর সাম্য দেখিতে পাই, সমাজে ততদূর সাম্য দেখিতে পাই না। ইহার কারণ বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ প্রভু হইয়াও ত্যাগী হওয়াই তাঁহাদিগের ধর্ম্মের চরম সিদ্ধি মনে করিতেন। ইউরোপীয়গণ যেন প্রভু হইয়া ভোগী হওয়াই তাঁহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন। ইউরোপের সাম্যে প্রতিযোগিতা প্রবেশ করায়, ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তনে, পরস্পরের হিংসা করার সমান অধিকার ও স্বাধীনতা আছে,—ফলে সাম্যের যেন এই অর্থ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের জাতিভেদ বৈষম্য, দয়াপ্রসূতসহযোগিতাগুণে সংশোধিত হওয়ায় একদিকে রক্ষা ও অন্যদিকে সেবার ভাবে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ শিক্ষা দিলেন যে "হে শূদ্রগণ! বিধাতা তোমাদিগকে দ্বিজগণের সেবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। (ক) দ্বিজসেবাই তোমাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের কাছে তোমার কোন অধিকার (খ) ও স্বত্ব নাই, তুমি ব্রাহ্মণের দাস।" অন্য

(ক) শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥
(মনু সং। ৮অ ৪১৩)

(খ) শূদ্রানাং দ্বিজশুশ্রূষা পরোধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিত্তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্॥
(পরাশর ১অ-৬১)

দিকে আবার শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণগণকে শিক্ষা দিলেন "হে ব্রাহ্মণ! দাসের আহার না হইলে তুমি আহার করিতে পাইবে না" (গ) এক দিকে বশ্যতা ও সেবা, অন্যদিকে রক্ষণ ও পালন। হিন্দুরা যেন বিবেচনা করিয়াছিলেন যে 'সকল লোক কিছু ঠিক সমান হইতে পারে না। সকল লোক ঠিক সমান জ্ঞানী, সমান ক্ষমতাশালী হইতে পারিবে না। কেহ ছোট কেহ বড় হইবে। শূদ্রগণ ছোট হউক আমরা বড় থাকি। ছোট যে, সে বশ্য-ভাব স্বীকার করুক, বড়র আশ্রিত হউক, বড়র সেবা করুক, বড়র সমান হইতে চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত থাকুক। তাহা হইলে ছোটতে আর বড়তে,সমাজের উচ্চলোকে ও নিম্নশ্রেণীর লোকে মাথা ঠুসাঠুসী হইবে না। অন্যদিকে যে বড় সে ছোটকে—আশ্রিত দাসকে রক্ষা করুক, স্নেহের সহিত প্রতিপালন করুক।

এই বৈশ্য ও রক্ষাভাব প্রাচীন হিন্দুসমাজে পরিব্যাপ্ত ছিল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে,প্রভু ও ভৃত্যে, স্বামী ও স্ত্রীতে, রাজা ও প্রজায়, গুরু ও শিষ্যে—সর্ব্বত্রই একদিকে বশ্যতা অন্যদিকে রক্ষা, এক-দিকে সেবা,অন্যদিকে লালনপালন। কেহ কেহ বলেন যে এই সেবা

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রং দ্রব্যোপদান মাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ সং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥

(মনু সং ৮অ-৪১৭)

(গ) "যে অজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত লোকদিগকে অন্নাদি না দিয়া আপনি ভোজন করে, সে জানে না সে মৃত হইলে, শকুনি ও কুকুরেরা তাহার দেহ ভোজন করিবে।"

(মনু সং ৩অ ১১৫)

ও রক্ষা সম্বন্ধ ইউরোপের প্রাচীন সমাজেও অনেকটা ছিল। জানি না—হইতে পারে। কিন্তু রক্ষা ও বশ্যভাব ছাড়িয়া, আমরা যে আধুনিক সাম্যভাব গ্রহণ করিয়া, অধিকতর সুখী হইয়াছি, তাহাতে সংশয় আছে। আধুনিক সাম্যভাবের ভিতরে বৈষম্যের বিষ রহিয়াছে। আধুনিক সমাজে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে, সম্পত্তি ও সুখলাভ করিবার সকলের সমান অধিকার আছে বটে। কিন্তু বাহুবলই হউক, আর মস্তিষ্ক বলই হউক সকলের বল সমান নহে। কেহ সবল কেহ দুর্ব্বল। সবল ও দুর্ব্বল সমান চেষ্টা করিয়া অসমান ফল পাইবে। এখানেই বৈষম্য হইল। তাহারপর আবার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার অর্থ অনেক স্থলেই সভ্যতার বেশে অসভ্য প্রকৃতির বিকাশক কার্য্য, কাড়িয়া লইবার বা ঠকাইয়া লইবার পরস্পরের অবিরাম চেষ্টা। এই অধর্ম্মমূলক প্রতিযোগিতা, সকল দেশেই বিষম বৈষম্য উৎপাদন করিতেছে। তাই (বিকৃত), সাম্যনিনাদিত ইউরোপ ও মার্কিন বৈষম্যময়। প্রকৃত সাম্য বস্তু খুব ভাল, উহা অমৃতস্বরূপ। কিন্তু ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলে মৈত্রীশূন্য হইলে, তাহা বৈষম্যময় হইয়া যায়, হলাহলে পরিণত হয়। আবার বৈষম্য জিনিস খারাপ বিষাক্ত পদার্থ। কিন্তু ধর্ম্মসিক্ত হইলেই, তাহার বিষাক্ত ভাব অনেক পরিমাণে উপশমিত হয়।

প্রাচীন জাতিভেদের যে গুণ ছিল, তাহা কতক আমি লিখিয়াছি। তাহার আরও গুণ ছিল। ইউরোপে ব্যবসায় সঙ্ঘ (Trades Union) দ্বারা (১) যে কার্য্য বা উপকার হইত, ভারতবর্ষে জাতিভেদ সেই কার্য্য করিত। এবং এখনও কতক

কতক করে। তবে ভারতবর্ষে জাতিভেদ বিচার না করিয়াও, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতি লইয়া একটী একটী ব্যবসার সঙ্ঘ গঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুরাট, আহাম্মদাবাদ, প্রোচে ইহার প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায়। (২) এক জাতির লোক পরস্পরকে সাহায্য করিত, অন্নাভাবে মরিতে দিত না, জাতিভেদ ইউরোপের "Mutual assurance societies "পরস্পর সাহায্য সমিতি" রূপে কার্য্য করিত। সুতরাং ভারতে কখনও "পুয়র ল" (Poor Law) আবশ্যক হয় নাই। (৩) প্রত্যেক জাতি তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের চরিত্রের উপর কতকটা পুলিশের ন্যায় দৃষ্টি রাখিত; কেহ কোনও দুষ্কর্ম্ম করিলে, বা বিবাদ উপস্থিত হইলে, এখনকার মত ঘৃণিত মোকর্দ্দমা হইত না; অপরাধীর বা বিবাদীর স্বজাতীয়গণ মিলিয়া তাহার দণ্ড বা মীমাংসা করিয়া দিত; দণ্ড করিতে হইলে জরিমানা করিত অথবা জাতিচ্যুত করিত। সুতরাং এই জাতিভেদ প্রথার ক্রিয়াতে, কয়েকটী কার্য্য সংসাধিত হইত। (১) সাম্যবাদী, "সোসিয়ালিষ্টিকদিগের" পরস্পরকে সাহায্য; (২) কতকটা দীনদুঃখ মোচন ব্যবস্থার "পুয়র ল"'র কার্য্য; (৩) পুলিশের তত্ত্বাবধায়িতা এবং সালিশের পূর্ণ বিকাশ।

কোনও কোনও পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জাতিভেদ প্রথার এত গুলি সুবিধা ছিল, তাহা আমরা ত্যাগ করি কেন? বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা রাখি না কেন? এই কথার উত্তর দিতে যাইলে, আর একটী বা দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বকালীন জাতিভেদ প্রথা আজিও আছে কিনা? জাতিভেদের সারাংশ যদি চলিয়া গিয়া থাকে,

তাহাহইলে তাহা আবার ফিরাইয়া আনা যায় কিনা? ইহাই উপস্থিত প্রশ্ন।

উত্তর। প্রাচীন কালে যে জাতিভেদ ছিল, বাস্তবিক সেই জাতিভেদ এখন আর আমাদিগের সমাজে নাই। তাহা এখন আর কোনও মতে ফিরাইয়া আনা যায় না।

এখন যে জাতিভেদ আছে, তাহা প্রাচীন কালের জাতিভেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অথবা তাহা প্রাচীন জাতিভেদের মৃত ও গলিত দেহ।

প্রাচীন জাতিভেদে জেতৃব্রাহ্মণগণ, সমাজের সাহেব ছিলেন; জিত শূদ্রগণ Niggers "নিগারস্" ছিল। এখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই সমভাবে "নিগারস্" পদবাচ্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ, সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ (ক) এই মনু বচন মনে রাখিয়া, কখন চাকুরী স্বীকার করিতেন না। এখন ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক-গণ সেই "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা"সেই কুক্কুর বৃত্তি চাকুরীর জন্য লালায়িত। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের বংশধরগণ অদ্য ম্লেচ্ছপদলেহন করিয়া রজতসুধা আস্বাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই কেবল সমাজের শিক্ষাদাতা ছিলেন। এখন ইংরাজ শিক্ষাদাতা। এখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়ই একাসনে বসিয়া ইংরাজের পদপ্রান্তে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। এবং এখন অনেক সময় শূদ্র ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিতেছেন। কেবল ইংরাজি বিদ্যায় নহে, বেদাদি বিষয়েও ব্রাহ্মণ, শূদ্রের গ্রন্থ পড়িয়া শিক্ষা-লাভ করিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কাহারও মুখা-পেক্ষা না করিয়া ব্যবস্থা দিতেন। এখন টাকা দিলে সব

(ক) সেবা কুক্কুরবৃত্তি, ব্রাহ্মণ কখন করিবে না। মনু—৪অ—৬।

ব্যবস্থাই পাওয়াযায়। ব্রাহ্মণ এখন জেতা নহেন, শিক্ষক নহেন, ব্যবস্থাপক নহেন, স্বধর্ম্মে রত নহেন, নিত্য "ভয়াবহ পরধর্ম্মে" রত। এবম্বিধ ব্রাহ্মণগণ কি ব্রাহ্মণ জাতির পূর্ব্বকালীন, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, সম্মান ও অধিকার রক্ষা করিতে পারেন? না। পুরাকালের ব্রাহ্মণজাতি, বঙ্কিম বাবু, ভূদেব বাবু, ও চন্দ্র নাথ বাবু যাঁহাদিগের গৌরব মানস-মন্দিরে ধ্যান করিয়া, ভক্তিভাষায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুজা করিয়াছেন, তাঁহারা আর বিদ্যমান নাই; তাঁহাদিগের উপযুক্ত বংশধরও নাই। যাহারা জীবিত আছে তাহারা, তুলনায়, প্রাচীন ব্রাহ্মণ কুলের কুলাঙ্গার সন্তান। পূর্ব্ব পুরুষগণের শিক্ষা নাই, জ্ঞান নাই, পবিত্রতা নাই, স্বাধীনতা নাই, তেজ নাই, ত্যাগ স্বীকার নাই—কিন্তু তাহারা পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রভুত্ব চাহে। শক্তিহীন প্রভুত্ব জগতে কবে কোথায় ছিল? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণগণ দম্ভ ত্যাগকর, অভিমান ত্যাগকর, অলীকতা ত্যাগকর। পূর্ব্ব পুরুষের দোহাই দিয়া আর চলিবে না। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, প্রাচীনজাতিভেদ চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন জাতিভেদ চলিয়া যায় নাই কি? প্রকৃত ব্রাহ্মণ শ্রেণী আর নাই। ব্রাহ্মণহীন জাতিভেদ—মস্তকহীন দেহ—অথবা নায়ক হ্যামলেটহীন নাটক হ্যামলেট। কেবল যে ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহা নহে। হিন্দু সমাজের অন্যান্য জাতিও নিজ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদে দ্বিজ ও শূদ্রগণের মধ্যে জেতৃজিতভেদ আর নাই, জ্ঞান ও চরিত্র ভেদ আর নাই, ব্যবসার ভেদ আর থাকিতেছে না, ধর্ম্মভেদ আর নাই। তবে জাতিভেদের আর আছে কি? বিবাহ ভেদ। এই বিবাহ ভেদের ভিত্তি কি?

অভ্যাসজাত সংস্কার ও মিথ্যা অভিমান। এই সংস্কার ও অভিমান সহজে যাইবে না। মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এই অভিমানের পোষক। আর দীর্ঘকালের সংস্কার দীর্ঘকাল স্থায়ী।

বিলাত যাত্রা।

প্রাচীন জাতিভেদ এখন আর চলিতে পারে না। বর্ত্তমান জাতিভেদেও দেশের মঙ্গল নাই, উপকার নাই কিন্তু অপকার আছে। প্রত্যুত ইহাতে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ইহা কপটতা, ভণ্ডামি, হিংসা, দলাদলি প্রভৃতি জঘন্য ব্যাপারের জন্মদাতা ও পোষক হইয়াছে, উদাহরণ স্থলে আমি এখানে বিলাত যাত্রা উল্লেখ করিতেছি।

ভূদেব বাবু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রক্ষণ প্রয়াসী, (হিন্দু) ধর্ম্ম মণ্ডলীর শিরোমণিছিলেন,সাহেবিয়ানাতে তাঁহার প্রগাঢ় ঘৃণা। আর্য্য শাস্ত্রের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এই ভূদেব বাবু বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, প্রাচীন ও নব্যহিন্দু সকলেরই শ্রোতব্য। তিনি তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক সারবান্ গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

"দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে হইতে পারে। এক,—স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহাতে বেতন ভোগী শিল্প বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোক দ্বারা, দেশীয় লোকদিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া। অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে জাপানীয়েরা স্বদেশে দ্বিতীয় পথটী লইয়াছে। চীনিয়েরা

কিয়ৎপরিমাণে প্রথম পথটী অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয় পথই যুগপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধহয়। তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত"। (পৃঃ ৩০১)

ইহা পড়িয়া কি বোধ হয়? হিন্দুর পক্ষেও বিলাত যাওয়াতে দোষ নাই। বরঞ্চ বিশেষ প্রয়োজনে যাওয়াই কর্ত্তব্য, ইহাই ভূদেব বাবুর মত বলিয়া বেশ অনুভব হয়। স্বদেশপ্রিয়, প্রাজ্ঞ ভূদেব বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহার প্রতি হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম মণ্ডলী প্রনিধান করুন; এবং দেশের উপকারের জন্য যে বিলাত যাওয়া হইতে পারে, তাহা অম্লান মুখে স্বীকার করুন্।

ভূদেব বাবু যে কথাটী বলিয়াছেন, তাহা সত্য ও অতি সহজ কথা। কিন্তু ভূদেব বাবু সমাজজ্ঞ। তিনি জানেন সমাজে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অতি সোজা কথাও শীঘ্র বুঝেন না। অথবা সংস্কার দোষে, বুঝিয়াও স্বীকার করেন না। প্রথা-বিরুদ্ধ অমিশ্রিত সত্যকথা এই সকল লোকের নিকট বড় তিক্ত ও অসহনীয়। প্রিয় উপকথা অপ্রিয় সত্য কথার সহিত Dilute বা মিশ্রিত করিয়া না দিলে তাঁহারা তাহা সেবন করিতে চাহেন না। তাই, বোধ হয়, এই সকল লোকের মন রক্ষা করিবার জন্য ভূদেব বাবু বলিতেছেন:—

"আমোদ প্রমোদ, বহাদুরী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্প-

বিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাতযাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে"। (পৃঃ ৩০১)

সভাস্থাপন বা বক্তৃতা করিবার জন্য বিলাতযাত্রা নিষিদ্ধ, আর শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য নিষিদ্ধ নহে, এই ব্যবস্থাটুকু ভূদেব বাবু হিন্দু শাস্ত্রের কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার ব্যবস্থার কোনও প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার বাক্য মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আধখানা বিলাতযাওয়া আধখানা বিলাত না যাওয়ার কথঞ্চিৎ অশ্রুতপূর্ব্ব মতটী আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তিনি বলিতেছেন ঃ—

"হিন্দু শাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন"।

বোধ হয় এইটী তাঁহার যুক্তি।—কিন্তু এই যুক্তি বড়ই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়। যুক্তিটী বিস্তৃত ভাবে লিখিতে যাইলে এইরূপ হয় ;—

(১) "হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার সৎকার্যের ব্যাঘাতক নহে"। "শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাতযাত্রা" প্রকৃত "সৎকার্য্য„। (৩) অতএব হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাতযাত্রার ব্যাঘাতক নহে। এই যুক্তির দোষ এই যে, ইহার প্রথম অঙ্গ সত্য হইতে পারে না।

মনুষ্য যতদিন দেবতা না হইবে, যতদিন সকল বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন প্রত্যেক শাস্ত্র প্রত্যেক সমাজ কোনও না কোনও সময়ে প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হইবেই হইবে। যদি বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য, অতএব তাহা অভ্রান্ত,

দিগের মানস চক্ষে উপস্থিত হইতেছে, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? সুতরাং ইহা সহজ কথা যে, ঈশ্বর বাক্য অভ্রান্ত। ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত ভাবে কোন জাতির নিকট উপস্থিত হইবার উপায় আজিও হয় নাই। যে জাতির বা যে ব্যক্তির জ্ঞান ও চরিত্র-নির্ম্মলতা যত অধিক হইয়া থাকে, সেই জাতির বা সেই ব্যক্তির ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল সমাজেই ভ্রান্তি কম বা বেশী মাত্রায় আছে। সকল সমাজেই সময় সময় ভ্রান্তি হয়, সময় সময় ভ্রান্তি হইয়া সৎকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। "হিন্দু সমাজ বা হিন্দুশাস্ত্র (কথন কোন সময়) সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহে" ইহা পক্ষপাতী, অসম্ভব ও অশ্রদ্ধেয় কথা। ভূদেব বাবু যদি বলিতেন যে, হিন্দু শাস্ত্রের ও সমাজের কথন প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক হওয়া উচিত নহে, কেন না ধর্ম্ম, সমাজ রক্ষার জন্য, তাহা হইলে তাঁহার কথা আমরা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু "হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহে" এই কথা সহজসত্যবিরোধী ও অলীক। সুতরাং ভূদেব বাবুর যুক্তির প্রথম ভাগেই প্রধান অঙ্গেই প্রমাদ ঘটিয়াছে। তাহার পর যদি তাহা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সৎকার্য্য মাত্রই হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এখন কোন্ কার্য্য সৎকার্য্য, আর কোন্ কার্য্য সৎ কার্য্য নহে, তৎসম্বন্ধে বুদ্ধিমান লোকেরও মতভেদ হয়। কংগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্রা ভূদেব বাবুর মতে বোধ হয় সৎকার্য্য নহে। কারণ তাহা "বক্তৃতাদির" অন্তর্গত, কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীমান্ ও

স্বদেশহিতপ্রেমী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর মতে তাহা সৎকার্য্য। আর বাক্যবল যে একটী প্রকৃত বল, তাহা বঙ্কিম বাবু তাঁহার "বাহুবল" ও "বাক্যবল" নামক প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। সন ১২৯৯ সালে কংগ্রেসের জন্য বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মত "হিতবাদী" সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিম বাবু অকুণ্ঠিত ভাবে, অসংশয়িত ভাষায় বিলাত যাত্রার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের জন্য বিলাত যাত্রা যে সৎকার্য্য নহে, এরূপ মত প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ কংগ্রেসের জন্য যাওয়া ভাল, এই তাঁহার মত, তাহাই বোধ হইয়াছিল। বিদেশে যাওয়ায় একটী বহুদর্শন হয়। এমন কি, যে জাতি সভ্য ও দিন দিন শ্রীলাভ করিতেছে, তাহার পক্ষেও বিদেশ দর্শন উপকারী, উৎসন্ন, পদাবনত আধুনিক হিন্দুদিগেরত কথাই নাই। ধনবৃদ্ধির জন্যই লোকে বাণিজ্য করে। কিন্তু এই বাণিজ্য হেতু ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা একটা মহত্তর উপকার হইয়া থাকে। বাণিজ্য করিতে গিয়া লোকে বিদেশীয় আচার ব্যবহার দেখিতে পায়; তাহা স্বদেশের আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে। অন্যদেশের আচার ব্যবহার দর্শন, উন্নতির উৎস খুলিয়া দেয়। এমন কোন দেশ নাই, যাহার অন্যদেশের নিকট কিছু শিখিবার নাই। এমন কোনও সমাজ নাই, যাহার চরিত্রের কোনও না কোন অংশ অন্য সমাজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, অন্যসমাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সংশোধনীয় নহে। আমরা যাহা বলিতেছি, যদি তাহা মনে স্থান না পায়, মহামতি মিল যাহা বলিয়াছেন, শুনুন;—

"But the economical advantages of commerce are surpassed in importance by those of its effects which are intellectual and moral. It is hardly possible to overrate the value, in the present low state of human improvement of placing human beings in contact with persons dissimilar to themselves and with modes of thought and action unlike those with which they are familiar * * such communication has always been and is peculiarly in the present age, one of the primary sources of progress. To human beings, who, as hiftherto educated, can scarcely cultivate even a good quality without running it into a fault, it is indispensable to be perpetually comparing their own notions and customs with the experience and examples of persons in different circumstances from themselves ; *and there is no nation which does not need to borrow, not merely particular arts or practices, but essential points of character, in which its own type is inferior.*"

সুতরাং যে উপলক্ষেই হউক, অন্য কোনও সুসভ্য দেশের সহিত সংশ্রবে আইসা বুদ্ধিমান ও গঠিত চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে উপকারী, সুতরাং আমাদের দেশের কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি সুসভ্য বিদেশে যদি কেবল মাত্র বেড়াইতে যান, যদি কেবল মাত্র সেই দেশের আচার ব্যবহার দেখিতে যান, তাহা হইলেও দেশের তাহাতে উপকার বই অপকার নাই। তজ্জন্য বিলাত যাত্রার পথে কাঁটা দেওয়াতে যে কি দেশহিতৈষিতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দুজাতি অনেক দিন হইতে একতা বর্জ্জিত। অনেক দিন হইতে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তাহার উপর আবার বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগকে পীড়ন করিয়া, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, বিচ্ছিন্ন সমাজকে কেন আরও ছিন্ন ভিন্ন করি, দুর্ব্বল সমাজকে কেন আরও দুর্ব্বল করি, হৃদয়ের শোণিতকে কেন বাহির করিয়া দেই?

যাঁহারা অকৃত্রিম ধর্ম্ম বিশ্বাস হেতু বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সহিত আহারাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুই বলিবার নাই,বরঞ্চ আমরা তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারা ভিতরে কিছুই মানেন না, নিশীথে মদিরা ও কুক্কুট মাংসে উদর পূর্ণ করেন, গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে যবনান্ন আহারে পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা যখন বিলাতপ্রত্যাগত যুবককে সমাজচ্যুত করণার্থ বদ্ধপরিকর হন,ঈর্ষাদগ্ধ, অর্থমুগ্ধ,পরপীড়নপুষ্ট, মিত্রদ্রোহী, হেয় ব্যক্তিগণের সহিত মিশ্রিত হন, তখন হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্ষোভ রাখিবার স্থান থাকে না।

ভূদেব বাবু বলেন ;—

"বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য ভক্তিভাবে আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও কয়েক স্থলে ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে।"

ভূদেব বাবু "দীনতা প্রকাশ" কি অর্থে লিখিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। ইহার অর্থ প্রায়শ্চিত্ত, না ইহার অর্থ গলায় কাপড় দিয়া প্রত্যেকের পায় ধরা, না ইহার অর্থ গোময় ভক্ষণ করা, না ইহার অর্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে উৎকোচ দেওয়া? প্রায়শ্চিত্ত? পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। প্রায়শ্চিত্ত সামাজিক দণ্ড বা অপমান প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি নিজে জানেন পাপ করেন নাই, তিনি কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? যিনি অপরাধী নহেন, তিনি কেন অপরাধ স্বীকার করিবেন? আর ভূদেব বাবু বলিতেছেন যে—

"যাঁহারা শিল্প বিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহাদিগের বিলাত যাত্রা হিন্দুশাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে।" যাহা শাস্ত্র-নির্ষিদ্ধ নহে, তাঁহারা তজ্জন্য কেন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন? কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে যে হিন্দু সমাজ বিলাতফেরতকে আদৌ গ্রহণ করেন না, তাহার উপায় কি? আর সমাজের ভয়েই হউক, আর রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, যাহাতে বিশ্বাস নাই, তাহাতে বিশ্বাসের অভিনয় করা কি অধর্ম্ম নহে? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে উৎকোচ দিয়া জাতি ক্রয় করা কি অধর্ম্ম নহে? অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাহা রক্ষা করিতে হয় তাহা কি রক্ষণীয়, তাহা কি (হিন্দু) ধর্ম্ম? এবম্বিধ "দীনতা" প্রচার করা কি অধর্ম্ম প্রচার করা নহে? কাপুরুষ বাঙ্গালীকে আরও কাপুরুষ করিয়া ফেলা নহে কি? সত্যকে দুর্ব্বল করিয়া অসত্যের প্রতাপ পরিবর্দ্ধন করা নহে কি? সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য; ইহা স্বীকার করি, শতবার স্বীকার করি। কিন্তু সমাজের ভয়ে, সমাজের খাতিরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের খাতিরে কণামাত্র মিথ্যার অনুষ্ঠান বা সত্যের লোপ করিবার জন্য কাহাকেও বলিতে পারিনা। কেন না সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমংতপঃ সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরোনহি। "দীনতা প্রকাশ"? কেন? বিলাত গিয়াছিলাম বলিয়া? জীবিকা নির্ব্বাহের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য বা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিলাত গিয়াছিলাম, তজ্জন্য "দীনতা প্রকাশ" করিতে হইবে? চাকুরীর নিম্নশ্রেণীর লাঞ্ছনা অতিক্রম করিয়া, সাহেবদিগের একচেটিয়া ভাঙ্গিয়া, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া, শাসয়িতৃ-বর্গমধ্যে যথাসাধ্য বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি বলিয়া "দীনতা

প্রকাশ করিতে হইবে”? বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল জলধি পার হইয়া, পরিবার ও বন্ধুবর্গের বিয়োগে ক্লিষ্ট হইয়া, দুঃসহ প্রবাস কষ্ট সহ্য করিয়া, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বিলাত গিয়াছিলাম বলিয়া, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, দেশে প্রত্যেকের পদপ্রান্তে প্রণত মস্তকে “দীনতা প্রকাশ” করিতে হইবে? কি দয়া! কি সুবিচার! কি কৃতজ্ঞতা! মস্তক মুণ্ডন করিয়া গোময় ভক্ষণ করিতে হইবে? জাতিবিক্রেতা স্বধর্ম্মচ্যুত অব্রাহ্মণদিগকে উৎকোচ দিতে হইবে? হিন্দুসমাজের পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে? যদি এইরূপ “দীনতা প্রকাশ” না করিলে হিন্দুগণ আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, দিন্; কি করিব? মন্দভাগ্য আমি, আর কি বলিব? কেবল বলিব;—

“হিন্দুসমাজ তোমার ক্রোড়ে আমি লালিত ও পালিত। আমি যাহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, স্নেহ করি, আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে তুমি আজিও হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছ—তোমার প্রতি অভক্তির বা অস্নেহের কথা আমি মুখ দিয়া বাহির করিব না। তোমার নিন্দা করিতে বুক ফাটিয়া যায়। কেবল এই বলি, তুমি নির্দ্দোষে অবিচারে তোমার স্নেহময় সন্তানকে নির্ব্বাসিত করিলে; সমাজের স্বজন-স্নেহশীতল সুখসচ্ছন্দময় উপকূল হইতে, স্বজনবর্জ্জিত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরে আমাকে ভাসাইলে। বিদেশে আমার যদি কিছু শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, তোমারই মঙ্গল, জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া, জীবনতরী চালাইব। যদি ধরাতলে ধর্ম্ম ও স্নেহ থাকে, একদিন তুমি

সন্তপ্তহৃদয়ে বাষ্পকুললোচনে তোমার নির্ব্বাসিত সন্তানকে সাদরে ফিরাইয়া আনিয়া হৃদয়ে তুলিয়া তাহার মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদময় স্নেহ বর্ষণ করিবে"। আমরাও বলি;—

"হিন্দুগণ! এরূপ ভক্ত সন্তানকে গোময় ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্তযুক্ত "দীনতা প্রকাশ" করিতে বলার কথা মুখে আনিবেন না। দীনতা দূরে থাকুক, আমরা বলি, এরূপ ভক্ত সুপুত্রকে নিশান উড়াইয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে গৌরবের রাজবর্ত্ম দিয়া, সমাজনিকেতনে আনয়ন করিয়া, হিন্দুগণ আপনাদিগের বর্ত্তমান কলঙ্ক অপনয়ন করুন"।

বিলাত-যাত্রা ও কপটতা।

বাঙ্গালাদেশের বাষ্পাতপজাত দৈহিক শিথিলতাবশতঃ হউক, অথবা পরাধীনতার নির্জ্জীবতাবশতঃ হউক, অথবা গৃহসুখ-লালসা হেতুই হউক, ইহা নিতান্ত সত্য যে, বাঙ্গালীর জীবনে একটা আলস্যের ঘোর লাগিয়াছে। বাঙ্গালী, অহিফেন-সেবীর ন্যায়, ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া হাই তুলিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কার্য্যশীলতা, উদ্যম, ও বিপদের নামে ভীরু ও অলস বাঙ্গালীর আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

কবে বাঙ্গালীর এই আতঙ্ক যাইবে? কবে এই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিবে? এ নিন্দিত নিদ্রার ঘোর যাহাতে ভাঙ্গে, তাহা অনিন্দিত নহে, তাহা প্রার্থনীয়।

এই ঘুমের ঘোর ভাঙ্গা পক্ষে, বিলাত-যাত্রা যে কতকটা সহায়তা করে, তাহার সন্দেহ নাই।

বাতোন্মথিত জলধির বজ্রনাদী নির্ঘোষ, উত্তাল তরঙ্গ-ঘূর্ণিত তরির আলোড়ন, লণ্ডন-মহানগরীর ঘন ঘোর রোল, কলকারখানার অবিরাম ঘর্ঘর নিনাদ, হয়ত বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারে। বিলাতের স্বাধীনতার স্ফুরিতাগ্নি, কার্য্যময়তার সংক্রামক তেজ, জীবন সংগ্রামের মহাকোলাহল, সমাজের ঘন ঘন উচ্ছাস, বীরত্বের ভৈরব হুঙ্কার হয়ত বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারে, হয়ত কর্ম্মশীল ও সাহসী করিতে পারে। তাই বলি, যদি স্বদেশহিতৈষী হও, যদি মিছা প্রাচীন গর্ব্বে ডুবিয়া না গিয়া থাক, যদি আবার মাথা তুলিতে চাহ, তাহা হইলে গোলে হরিবোল দিয়া, মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া, যাহা অন্তরে বিশ্বাস কর না, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিয়া, স্বজাতির উন্নতির পথে কণ্টক দিওনা; নিরপরাধী বিলাতফেরত শিক্ষিত সন্তানগণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনাকে আপনি দুর্ব্বল করিও না। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব বাবু, মহানুভব বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, সমাজের প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়া উচিত। আমি এই কথা মাথায় করিয়া লই। কিন্তু যাহা সত্য কথা, তাহা আমাকে বলিতে হইবে। ইহাতে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য নাই। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা রাগে বা দ্বেষে লিখিতেছি না। দুঃখে লিখিতেছি। আমার লিখিত সত্য কথা যদি কাহারও মনে ব্যথা দেয়, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, প্রার্থনা করি।

আমি উপরে বলিয়াছি "মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া" বিলাত-প্রত্যাগত সন্তানগণকে সমাজচ্যুত করিও না। "মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া"? হাঁ, "মিছা করিয়া ধর্ম্মের নাম লইয়া" এই কথা অনেক বর্ত্তমান হিন্দুর পক্ষে খাটে। প্রায় প্রত্যেক

ইংরাজি-শিক্ষিত হিন্দু-পরিবারে কেহনা কেহ ম্লেচ্ছ আহারে বা পানে লিপ্ত। জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়, আপনি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন? কেমন করিয়া একসঙ্গে আহার করেন? আপনি বলিবেন, অন্যে কে কোথায় ঘরের ভিতর, আমার অগোচরে, কি করে বা কি না করে, তাহা আমি করি না, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, অন্যে গোপনে কি করে, আপনি যদি তাহা ঠিক নাই জানেন, আপনার নিজ ঘরে পুত্র বা ভ্রাতা আপনার জ্ঞাতসারে নিত্য যে কুক্কুট মাংস ভোজন করেন, মধ্যে মধ্যেই ভ্রমর-কৃষ্ণ শ্মশ্রু শোভিত বাবুর্চ্চির হস্তে পলান্ন ও "কট্‌লেট্‌" লেহন করেন। তদ্বিষয় কি বলেন? তাঁহার সহিত আহারাদি করিতে কি আপনার হিন্দুধর্ম্মে বাধে না? যত আপত্তি ঐ বিলাত-ফেরত সম্বন্ধে? আর আপনি ইংরাজি-ভক্ত শুভ্র-কেশধারী হিন্দু, আপনাকেও বলি. আপনি নিজে যে নিশাতে নির্জ্জন-গৃহে যাহা আহার করেন, তাহা কি হিন্দুধর্ম্মে বাধে না? হিন্দুধর্ম্মে বাধে বুঝি কেবল বিলাত-ফেরত? ঘরে ঘরে দেখ কি ব্যাপার! গোপনে, প্রকাশ্যে চলিতেছে,দেখুন কি ব্যাপার! প্রকাশ্যে? হাঁ প্রকাশ্যে, কত স্থানে। তাহার সম্বন্ধে হিন্দু-দলপতিগণের কথাটা নাই।

একদা, নবদ্বীপের ও অন্য স্থানের পণ্ডিতগণ কোনও ধনী হিন্দু-ভবনে উপস্থিত। ধনবান্ যজমান শূকর গোমাংস কিরী-টিত ভোজ প্রকাশ্যে ভোজন করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে, পণ্ডিত-মণ্ডলীদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী চরি-তার্থ হইলেন। পরে শূকর-গোমাংস-ভোজীর ভবনে আহার

করিলেন; এবং রজত-রূপী প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এখানে হিন্দুধর্ম্মে বাধিল না। স্মৃতি বা শ্রুতি, ভাষ্য বা টীকা, যুক্তি বা দেশাচার এই শূকর গোমাংসভোজী হিন্দুভবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগের আহার ও বিদায়ের অবিধেয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিল না, তাহারা যাহা কিছু বলে কেবল বিলাত ফেরতদিগকে। অপূর্ব্ব (আধুনিক) হিন্দুধর্ম্ম! তোমার লীলা কে বুঝিবে?

পূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। তাহা এখানে মনে আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনও এক হিন্দু রাজার বাটীতে গিয়াছিলেন। রাজা ঘোর সাহেব। টেবিলে ভিন্ন "ডাইন" করেন না, যবনের হাতে ভিন্ন অন্ন রোচে না। একদিন রাজভবনে এই রাজার গুরুদেব, এবং দেশের একজন প্রধান স্মার্ত্ত অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজা আসীন। এমন সময় একজন হাড়ি বাবুর্চ্চি ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল "হুজুর আজি বান্দার প্রতি কি কি ডিশ হুকুম হয়?" রাজা নিজের মনের মত খানা হুকুম করিলেন। হাড়ি বাবুর্চ্চি অন্তর্হিত হইল। পণ্ডিতপ্রবর গুরুদেব ও স্মৃতিরত্ন মহাশয় নিস্প্রভ হইয়া যাইলেন। কিন্তু গুরুর কর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়া। সুতরাং তিনি বলিলেন "মহারাজ যবন বাবুর্চ্চি ছিল, তাহার উপর আবার হাড়ি বাবুর্চ্চি কেন? এটা নিষ্প্রয়োজন অত্যাচার নহে কি?" রাজা বলিলেন "না ঠাকুর নিষ্প্রয়োজন নহে। অপ্রয়োজনে একজনের স্থলে দুইজন কেন রাখিব? দুঃখের কথা বলিব কি ঠাকুর, মুসলমান বাবুর্চ্চিটা, সব রাঁধে, কেবল শূকর রাঁধিতে নারাজ। হাড়ি বাবুর্চ্চি পাষণ্ড, সব রাঁধে, কিন্তু কোন মতে গোমাংস পাক করিবে না। সুতরাং

উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, মুসলমান ও হাড়ি উভয় বাবুর্চ্চি রাখিতে হইয়াছে।” পণ্ডিতদ্বয়ের মুখদ্বয় প্রভাতের চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় একবারে প্রভাহীন হইয়া যাইল। কিন্তু এই রাজাকে সমাজ-চ্যুত করার কথা কখন উঠে নাই। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের নিকটে, এই রাজার আচরণ বাধে নাই। হিন্দু ধর্ম্মে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট, বাধে কেবল বিলাত-ফেরত।

দেশে বসিয়া যাহা খুসি তাহাই কর না কেন (বিশেষতঃ যদি টাকা থাকে) তাহাতে জাতি যায় না; কিন্তু বিলাত যাইলে জাতি যায়, এই রহস্যের তথ্য কি? ইহার উত্তর, আমি, জাতি-ভেদ সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, তাহাতে প্রকারান্তরে দিয়াছি। ইহার উত্তর প্রাচীন জাতিভেদের ভিতব যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে, এখন যাহা আছে তাহা মন্দ, তাহা সমাজের অনিষ্টজনক, তাহা কপটতা-পোষক, ঈর্ষাচালিত, ভীরুতাবর্দ্ধক।

বিলাত-ফেরতদিগের সমাজচ্যুত করণপক্ষে সমাজশাসক বা কার্য্য-চালক কে, তাহা মনে করিয়া দেখিলেই আমার কথা পরিষ্কার হইবে। যাঁহারা নিজে যথার্থ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য বিলাত-ফেরতের সঙ্গে মিশেন না, তাঁহারা বিলাত-ফেরতকে সমাজ-চ্যুত করার পক্ষে কোন কার্য্যই করেন না। কারণ তাঁহারা এখন প্রায় সমুদয় হিন্দুসমাজকে পতিত মনে করেন, এবং সমাজের সহিত আহারাদি করেন না। এবং এখনকার ইংরাজি-শিক্ষিত কুক্কুটভোজী (বা গোখাদক) নব্য হিন্দুর এবং বিলাত-ফেরতের মধ্যে কোন প্রভেদই দেখেন না।

এখানে একটী বাস্তবিক ঘটনা বলি;—কোনও সম্ভ্রান্ত

ব্রাহ্মণ পরিবারে একটী ব্রাহ্মণ কন্যা আছেন। ইনি আ-শৈশব-বিধবা এবং ব্রহ্মচারিণী, স্নেহের বন্ধনে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র-গণের সংসারে থাকেন। ভ্রাতষ্পুত্রগণ ইংরাজি নবিশ নব্য তন্ত্রযুবক। তিনি তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য আহার করেন না, রোগের সময় শুশ্রূষাদির জন্য ভ্রাতষ্পুত্রদিগকে যখন স্পর্শ করেন, তখন স্নান না করিয়া আর জলগ্রহণ করেন না। স্নান করিয়া তাঁহার হবিষ্যের ঘরে যান, সেখানে রন্ধন ও আহার হইলে ভ্রাতষ্পুত্রদিগের কক্ষে আইসেন। তাঁহার এক ভ্রাতষ্পুত্র বিলাত যাইলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার সময় উপস্থিত হইল। বিধবার অন্য ভ্রাতষ্পুত্রগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের বিলাত ফেরত ভ্রাতার সহিত যদি আমরা এক সংসারে থাকি, তাহা হইলে আপনি এই নূতন বাটীতে আমা-দিগের সংসারে একত্র থাকিবেন, না আমাদিগের পুরাতন বাটীতে স্বতন্ত্র বাস করিবেন? তাহাতে ব্রহ্মচারিণী বিধবা উত্তর করিলেন—"কেন, তোমাদিগের সংসারে এই বাটীতে এখন যেমন থাকি, তেমনি থাকিব। তোমরা বিলাত যাও নাই, সে বিলাত গিয়াছে। কিন্তু তোমাদিগেরও তাহার মধ্যে আমার নিকট কোনও প্রভেদ নাই। তোমাদিগের সংসারে আমি যেরূপভাবে আছি, তাহার সহিত সেইরূপভাবে একসঙ্গে থাকাতে কোনও দোষ দেখি না।" এই ব্রহ্মচারিণীর হিন্দুধর্ম্মে যথার্থ বিশ্বাস আছে। তাহার কঠোর ব্যবস্থা তিনি কায়মনো-বাক্যে পালন করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহার অকপট উক্তি কি ভাবিয়া দেখুন। হিন্দু সমাজের প্রাচীন হিন্দুয়ানীর প্রতি যাঁহাদিগের অকপট বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের কার্য্য এই

বিধবার কার্য্যের অনুরূপ হইয়া থাকে। তাঁহারা জানেন "ঠক বাঁছিতে গাঁ ওজর" হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা কাহাকেও "একঘরে" করিতে ব্যস্ত হন না। তাঁহারা অন্তরে জানেন, বাস্তবিক অখাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি আচার ব্যবহার বিচার করিয়া "একঘরে" করিতে হইলে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোককে একঘরে করিতে হয়; এবং এইরূপে "একঘরের" দল "অনেক ঘরে" হইয়া পড়ে এবং "একঘরে" করণ প্রয়াসিগণ নিজেই একঘরেদশাপন্ন হন। সুতরাং এই সকল বুদ্ধিমান ও অকপট ব্যক্তিগণ, অন্যের উপর হস্তারক না হইয়া, নিজের ধর্ম্ম নিজেই রক্ষা করিয়া চলেন, এবং অনর্থক কোলাহল না করিয়া স্ব স্ব বিশ্বাসমতে বিশ্বেশ্বরের উপাসনা করেন।

তবে বিলাত-ফেরতকে এক ঘরে করে কে? ইহার উত্তর দিতেছি;—সকল সমাজেই হিংস্রক ও পরশ্রীকাতর লোক আছে। কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইলে এই সকল লোক অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। কোন গতিকে অন্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধা দিতে পারিলে, অথবা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারিলে, এই সকল দ্বেষ্টাগণের অন্তর্দাহ কতক পরিমাণে উপশমিত হয়। ইহারা একজন উন্নত ব্যক্তিকে নত করিবার জন্য, দশজন লোক লইয়া দল বাঁধে। ইহারাই গ্রামে দলাদলির আগুন জ্বালিয়া দেয় এবং গ্রাম ছারখার করে। যে সকল হিন্দু বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা প্রায়ই, কেহ সিভিলিয়ান, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ ডাক্তার ইত্যাদি উচ্চ পদলাভ করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করেন। বিলাতে না গিয়া কেহ উন্নতি

লাভ করিলে, তাহাকে বিপন্ন করা সহজ নহে। কেননা, তাহার একটা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। আবার সেই ছিদ্র এমন হওয়া চাই, যাহা সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। কারণ অধিকাংশ লোকের যে দোষ আছে, কেবল মাত্র তাহা উপলক্ষ করিয়া একজনকে পীড়ন করিতে যাইলে অধিকাংশ লোকই তাহাতে সম্মত হইবে না। কিন্তু বিলাত-ফেরত হিন্দুকে পীড়ন করিবার জন্য হিংস্রক লোক-দিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কেন না, বিলাত যাওয়া ছিদ্র বা (কল্পিত) দোষ সমাজের অধিকাংশ লোকের নাই। ইহা নূতন এবং অনেকের মতে হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী। হিন্দু-শাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য,যথা কুক্কুট ভোজন,যবনান্ন ভক্ষণ ইত্যাদি কার্য্যও, এখানে থাকিয়া অনেকে করিতেছেন, তাহাতে তাহারা এক-ঘরে হন না কেন? তাহার উত্তর তাহারা 'হাজার ঘরে' অর্থাৎ বহুসংখ্যক। হয়ত হিংস্রক ব্যক্তিরা নিজেই কোমল কুক্কুট-মাংস-লোলুপ, হয়ত নিজেই যবনান্ন-ভোজী আর কুক্কুট বা যবনান্ন ভোজন কিছু সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করে না। সুতরাং হিংসাপ্রবৃত্তি তাহাতে উদ্দীপিত না হইতে পারে। কিন্তু বিলাতগমনে অধিকাংশ স্থলে (১) সাংসারিক উন্নতি আছে (২) ছিদ্র আছে (৩) এবং এই ছিদ্র অল্প লোকের আছে। সুতরাং হিংস্রব্যক্তিদিগের বড়ই সুবিধা। খবর আসিল, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিনয় কুমার বিলাত হইতে আসিয়াছে। কেবল বিলাত হইতে আসে নাই, সিভিলি-য়ান হইয়া আসিয়াছে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তির হিংসার শিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হিংসা দাসের মুখ আঁধার হইয়া

যাইল। সে ভাবিল, গোল পাকাইতে হইবে, এখন হইতে তাহার সূত্রপাত করিয়া রাখা যাউক। সে তখন হন হন করিয়া কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাইল। কেদার বাবুর ওখানে খুব পাশার ধূম। যখন "কচে বার" শব্দ থামিয়া গেল, পাশা উঠিয়া গেল, তখন একথা সে কথার পর হিংসাদাস বাবু হুঁকা হাতে করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "ওহে, কৃষ্ণনাথের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়াছে শুনিয়াছ কি ?" শ্যামাচরণ ভাদুড়ী বলিলেন "হাঁ শুনিয়াছি ছেলেটি বেশ।" তখন হিংসাদাস বাবু বলিলেন "ছেলেটি ভাল, তা তুমিও জান আমিও জানি; আর সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছে; পরম সুখের বিষয়। তবে সমাজে চলিবে কি ?" তখন ভোলানাথ গাঙ্গুলি বলিলেন "আমরা দশজন চালাইলেই চলিতে পারে।" হিংসাদাস বাবু তখন তাঁহার ললাট কুঞ্চিত করিয়া, মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন "মহাশয় আপনিত বলিলেন, কিন্তু দশজনে বলে কৈ ? আমার বড় আশঙ্কা হয়, ছেলেটাকে লইয়া বড় গোল হইবে।" সেই বৈঠকে হীনকান্তি ঘটক মহাশয় ছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে 'আমি গরিব গুণহীন, আমাকে কেহ গ্রাহ্যই করে না। এইবার দেখিব, আমাকে গ্রাহ্য করে কি না; শর্ম্মারাম একটা ব্যক্তি কি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাহার বন্ধুগণ আমার পায় না ধরিলে, আমি কখনই তাহার পুত্রকে সমাজে লইতে দিব না। এ দিকে অর্থ-মুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয় বসিয়া আছেন। কেদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্মৃতিরত্ন মহাশয়, বিলাত-ফেরত চলিতে পারে কি ?" তিনি উত্তর করিলেন "চালালেই, চলিতে

পারে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আশ্রয় লইলে, তাঁহারা অবশ্য ইহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। তবে ব্যয় বাহুল্যে কাতর হইলে, এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।” তখন হীনকান্তি বাবু বলিলেন “হাঁ ব্যয় করা চাই বই কি? তাহার উপর নরম হওয়া চাই, দশ জনের বাটীতে যাওয়া চাহি, একটু কাকুতি বিনতি করা চাহি, তাহা না হইলে লোকের মন ভিজিবে কেন! যে সে দোষ নহে, বিলাত যাওয়া দোষ। সহজে কি তাহা কাটিয়া উঠা যায়?” তখন হিংসাদাস বলিলেন “তা বটেই ত।” হীনকান্তি বাবু উঠিলেন; হিংসাদাসও উঠিলেন। দুই জনে কথা কহিতে কহিতে হিংসাদাসের বাটীতে যাইলেন। সেখানে ধূমপান করিতে করিতে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কি করিয়া এক ঘরে করিতে হইবে, তাহার মতলব ঠিক হইল। তাহার পরদিন হিংসাদাস ও হীনকান্তি এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিবাদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ওখানে যাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মামলা হইয়াছিল। তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই হারিয়াছিলেন। হিংসাদাস মহাশয় বিবাদনাথ বাবুকে বলিলেন “মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বিলাত হইতে আসিয়াছেন। আপনার সঙ্গে অনেক দিন হইতে খাওয়া দাওয়া নাই, আপনারত কোন গোলই নাই। আমরা এখন কি করি বলিতে পারেন?” তখন বিবাদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “রামা তামাক দে” হাঁকিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খাওয়া দাওয়া নাই সত্য। আমার সঙ্গে একটা মামলা হইয়াছিল, তাহাও সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জাত্যংশে আমি কোনও অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এ বিষয় সকলকেই নিজে নিজে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। আমি নিজের বিষয় এই বলিতে পারি যে, যাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এখন খাওয়া দাওয়া করিবেন আমি তাহাদের সহিত খাওয়া দাওয়া করিতে পারিব না।” হিংসাদাসও ও হীনকান্তি বাবু এই কথা শুনিয়া মহাহর্ষে তাহা এবাড়ী ওবাড়ী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, ‘অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অমুক খাইবে না, তজ্জন্য তাহার ভগ্নিপতি খাইবে না, ভগ্নিপতিকে ছাড়িয়া তাহার মামা খাইবে না, অমুক খাইবে না, অমুক খাইবে না’ ইত্যাদি। ইতিমধ্যে কাশীনাথ গাঙ্গুলির মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল। গাঙ্গুলি মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধু ও সদাশয় ব্যক্তি। তিনি নিমন্ত্রণে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বাদ দিতে ইচ্ছুক নহেন। তখন হিংসাদাস বাবু, হীনকান্তি বাবু, বিবাদনাথ বাবু এবং অর্থমুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সায়াহ্নে শ্রাদ্ধের বাটীর প্রাঙ্গণে, তাহাদের দলের লোক লইয়া আসিয়া একটা পার্লিমেণ্ট বসাইয়া দিলেন। সেই শ্রাদ্ধের উপলক্ষে তখন সরলতা, যুক্তি, ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। অধুনা আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই এমন স্বার্থপর, যাহাতে নিজের কিছু অনিষ্ট নাই, অথচ অন্যের ঘোরতর অনিষ্ট আছে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য, সামান্য আয়াসও স্বীকার করিতে চাহে না। অন্যে মরে মরুক, আমার কি—এইরূপ ভাবিয়া থাকে। তাহার উপর আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই, যে কারণেই হউক, অতিশয় ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন দেশের

লোক কর্ত্তব্য সাধনের আহ্বানে মৃত্যুরূপিনী জ্বলন্তশিখাতে মাভৈ মাভৈ রবে অবলীলাক্রমে লম্ফ দিয়া পড়িতেছে। যেখানে বিপদ যেখানে বাধা, যেথানে কষ্ট সেখানে তাহাদের তেজের অদম্য স্ফুলিঙ্গ শতধা বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সত্যের অনুরোধে, পরোপকারের অনুরোধে, পর-পীড়ন-নিবারণ-সংগ্রামে, স্বাধীন দেশে মহানুভব ব্যক্তিগণ সময়, শ্রম, ধন, প্রাণ, জলের ন্যায় ঢালিয়া দিতেছেন। হিন্দু সমাজে ঐরূপ বীরত্ব দেখিতে পাইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। হিন্দু সমাজে যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে বিলাতে যাওয়ায় দোষ নাই, অধর্ম্ম নাই, বরঞ্চ বিলাত-ফেরতদিগকে পীড়ন করাতে দোষ ও অধর্ম্ম আছে, দেশের অমঙ্গল আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশ লোকই, বিলাত-ফেরত-পীড়ন-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; হিংসাদাস ও হীনকান্তি বাবুদিগের ও অর্থমুগ্ধ স্মৃতিরত্ন মহাশয়দিগের আত্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, পরপীড়াদায়ক কার্য্যের সাধ্যমত প্রতিবাদ ও প্রতিকার না করিয়া, তাহাতেই তাঁহারা জৃম্ভণ করিতে করিতে যোগ দেন।

এখন আমরা দেখিলাম, বিলাত-ফেরতদিগের পীড়ন করার মূল (১) হিংসা ও হীনতা; (২) উদাসীনতা ও স্বার্থপরতা (৩) ভীরুতা বা কাপুরুষতা; এই ত্রিবিধ কারণ ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে, তাহা (৪) ভ্রান্তি। কতকগুলি লোক সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত যুবক, হিন্দুসমাজে গৃহীত হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। যাঁহারা সরল বিশ্বাসের উপর কাজ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও আমাদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিশ্বাসের কারণ

কি, তাহা আমরা কখনই তাঁহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে শুনি নাই। দেখা যাউক, কি জন্য তাঁহাদিগের মতে বিলাত গমন অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। "বিলাত যাইলে হিন্দু নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিতে হয়,"—এইটী বিলাত-গমন-বিরোধিতার কারণ বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু বিলাত না গিয়া হিন্দু সন্তান এখানেই ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করিতেছেন। তাহাতে সামাজিক শাসনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। বিলাত যাইলে সাহেবি চাল চলন হইয়া যায়; ইহাও বিরোধিতার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বিলাত না গিয়া এখানেই যাঁহাদিগের অবস্থা কতকটা ভাল, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোট, প্যানটুলেন, কলার, কলেবরে ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রভেদ এই, বিলাত-ফেরতদিগের যে সাহস টুকু আছে, ইহাঁদিগের তাহা নাই। বিলাতে যাইলে স্বীয় সাহিত্যের উপর অনুরাগ থাকে না, ইহাও প্রকৃত কথা নহে। কারণ কয়জন হিন্দু বিলাত না গিয়া, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ন্যায়, স্বদেশের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন? বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ গুরুজনের মান্য করে না; ইহাও সত্য কথা নহে। শ্রীযুক্ত মনমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এই মহাশয়দ্বয়ের মাতৃভক্তির কথা কে না জানে? পিতা মাতা ও অন্য গুরুজনকে ভক্তি করে না, এমন কুষ্মাণ্ড যেমন অবিলাতগত হিন্দুদিগের মধ্যে আছে, তেমনি বিলাতগত হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে।

দেশের লোকের প্রতি মায়া, মমতা থাকে না; একথাও খাটে না। দেশের লোকে বিপন্ন হইলে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মন-

মোহন ঘোষ মহাশয় যেরূপ বিনা পয়সায় তাঁহার মূল্যবান সময় অকাতরে ব্যয় করেন, অবিলাতগত কয়জন উকিল তাহা করিয়া থাকেন? শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ যেরূপ দেশের জন্ত শ্রম করিয়া থাকেন, কয়জন অবিলাতগত ব্যক্তি তাহা করিয়া থাকেন?

বিলাত হইতে অনেকে কেবল মদ খাইতে শিখিয়া আইসেন এবং দাম্ভিক হয়েন। এই কথা লিটনার সাহেব বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। "অনেকে" নহে। কেহ কেহ হইতে পারে। পদ ও ধন বিলাত না যাইলেও যেমন অনেককে দাম্ভিক করে, বিলাত ফেরতের মধ্যেও সেইরূপ করে। পূর্ব্বে বি-এ, এম্-এ, ধারীগণ কতকটা আপনাদিগকে বড়লোক মনে করিতেন। এখন বি-এ, এম-এ, অনেক। সুতরাং বি-এ, এম-এ, গণ এখন আপনাদিগকে আর তেমন বড় বিবেচনা করেন না। তেমনি এখন যদিও বিলাত-ফেরতগণ, সংখ্যায় অল্প থাকায় আপনাদিগকে কথঞ্চিৎ বড় বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক হইলে আপনাদিগকে আর বড় বিবেচনা করিবেন না। বিলাত-ফেরত সম্প্রদায় একটা ঘৃণার্হ দল নহে। বরঞ্চ মানার্হ, বিদ্বান্, দক্ষ, দেশহিতৈষী, এবং কোন কোন গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের নেতা।

যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ বিপদে আমাদিগের সহায়, সাহিত্যে আমাদিগের গৌরব, রাজনীতিরণে আমাদিগের সেনাপতি, ব্যবস্থাপক সভায় আমাদিগের প্রতিনিধি, আমরা কোন্ লজ্জায় তাঁহাদিগকে অনর্থক পীড়ন করিতে চাহি? যে সম্প্রদায়, জাতিতে আমাদিগের অঙ্গ, শোণিতে আমাদিগের

ভ্রাতা, ধর্ম্মে ও বিশ্বাসে, বিপদে ও সম্পদে আমাদিগের সহিত অভিন্ন, কোন্ প্রাণে আমরা তাঁহাদিগকে ভিন্ন করিতে চাহি? তাঁহারা নিজেরা হিন্দু সমাজ ছাড়িয়াছেন, এ কথা সত্য নহে। আমরা কেহ হিংসায়, কেহ হীনতায়, কেহ উদাসীনতায়, কেহ স্বার্থপরতায়, কেহ কাপুরুষতায়, কেহ কপটতায়, কেহ বা ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া দেই। কি লজ্জার কথা! কি দুঃখের বিষয়!

নূতন ব্রাহ্মণ রাজ্য।

হিন্দুগণ! জাতিভেদের দোহাই দিয়া সমাজের পীড়াদায়ক গৃহবিচ্ছেদজনক অনিষ্ট কার্য্য দ্বারা আপনার পদে আপনি কেন পরশু আঘাত করেন। প্রাচীন জাতিভেদ চিরকালের তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখাইয়াছি। যাহা চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না, তাহার মধুর মোহনগীতি আর শুনিতে চাহি না। বিশাল প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ব্রাহ্মণ্যরাজ্য শনৈঃ শনৈঃ গঠিত হইতেছে। এই নবযুগে নূতন ভাবে গুণ ও চরিত্রভেদে সমাজ বিভক্ত হইতেছে, নূতন ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাচিত হইতেছেন। বুঝিয়া দেখিলে ইহা প্রাচীন আর্য্যদিগের ব্যবস্থার বিপরীত নহে। কেননা, শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, এই সংসারে জাত্যনুসারে, কেহ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও ম্লেচ্ছ হয় না। গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদে, কেহ বা ব্রাহ্মণ কেহ বা ক্ষত্রিয়, কেহ বা বৈশ্য ও কেহ বা ম্লেচ্ছ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে *।" এই প্রাচীন মহর্ষির

---

* ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব বা
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ। শুক্রনীতি—অ ১।

ব্যবস্থানুসারে, আমাদিগের নূতন ব্রাহ্মণরাজ্যে, লোক, গুণ ও কর্ম্ম প্রভেদে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানের অনুশীলন ও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া দেবারাধনায় অনুরক্ত এবং যিনি * জিতেন্দ্রিয় বিনয়ী ও দয়ালু, তিনিই ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ যাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম,বিদ্যা ও চরিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ইহা কেবল যে শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহা নহে। অন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই কথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন। গৌতম-সংহিতায় আছে "ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র" † "ন জাতি পূজ্যতে রাজন্"—"হে রাজন জাতিপূজ্য নহে" "গুণাঃ কল্যাণ কারকাঃ" "গুণই কল্যাণকারক"। মহাভারতের বনপর্ব্বে একস্থানে আছেঃ—পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ, প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্র সদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তিনিও ব্রাহ্মণতুল্য পরিগণিত হন। কারণ ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়"। আর একস্থানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—"শূদ্রবংশে জন্মিলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে" মূলকথা—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাম্ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ "বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেননা সমস্ত

---

* জ্ঞানকর্ম্মোপসনাভি দেবতারাধণে রতঃ।
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃকৃতঃ॥

† সান্তং দান্তং জিত ক্রোধং জিতাত্মনং জিতেন্দ্রিয়ং।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃশূদ্রা ইতিস্মৃতাঃ॥

জগৎ ব্রহ্মময়”। গুণ ভেদেই জাতিভেদ হইয়াছে। তাই আবার বলি, গুণ ভেদ অবলম্বন করিয়া আমরা নূতন ব্রাহ্মণ রাজ্য সংস্থাপন করি। এই নব ব্রাহ্মণ্যরাজ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান কবিত্ব, দর্শনশাস্ত্র থাকিবে; কিন্তু তাহাদিগের কোনও এক-চেটিয়া অধিকার থাকিবে না—সেখানে ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন প্রভুত্ব থাকিবে, অথচ শূদ্রদিগের বা অন্য কোনও শ্রেণীর উপর অত্যাচার থাকিবে না। সেখানে যে মূর্খ ও দুশ্চরিত্র, সে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও, ব্রাহ্মণত্ব হারাইবে, আর শূদ্র পণ্ডিত ও সাধু হইলে ব্রাহ্মণ হইবেন সেখানে ব্রাহ্মণগণ নিজের প্রভুত্ব প্রয়োগ করিবেন বটে, কিন্তু তাহা শূদ্রদিগকে উন্নত, সাধু ও জ্ঞানী করিবার জন্য; তাহাদিগকে পদতলে রাখিবার জন্য নহে। সেখানে ব্রাহ্মণগণ—নূতন নূতন বেদ, দর্শন, সংহিতা রচনা করিবেন। এবং তাহা অধ্যয়ন করিবার জন্য, অজ্ঞ শূদ্রগণকে প্রাণের ভাইয়ের মত ভালবাসিয়া সাদরে আহ্বান করিবেন। সেখানে বেদ দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিবার জন্য জ্ঞানের ও ধর্ম্মের মন্দির মনুষ্য মাত্রেরই জন্য অবারিতদ্বার থাকিবে। সেখানে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম, উপদেশে ও জীবনে সকলেই শিক্ষা দিবেন। সেখানে স্বার্থের পরিবর্ত্তে পরার্থ বিরাজ করিবে। সেখানে শক্তিশালী শ্রেণীগণ দুর্ব্বল শ্রেণীর লোকদিগকে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলকেই অসঙ্কুচিত, উদার, সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে সকল বিষয়ে পূর্ণ ও প্রাপ্য অধিকার দিয়া, সমাজের পক্ষপাতী ব্যবস্থারূপ শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবেন। এই মানবগণ মুক্ত হইয়া জ্ঞান, কবিত্ব ও পবিত্রতার

অনন্ত আকাশে বিচরণ করিবে—স্বর্গীয় বিহঙ্গের ন্যায়, নূতন ব্রাহ্মণরাজ্যের গৌরবগান করিতে করিতে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর মণ্ডলে আরোহণ করিবে।

আইস, তবে ব্রাহ্মণ কুমারগণ, আইস তবে ব্রাহ্মণ কন্যাগণ আমরা সাধু ও জ্ঞানী শূদ্রগণকে ব্রাহ্মণদলে লইয়া, অসাধু ও অজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, নূতন এক ব্রাহ্মণদলের সৃষ্টি করি, এবং এক নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্থাপন করি। পূর্ব্বে আমরা ক্ষত্রিয়ের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলাম, কেবলমাত্র শিক্ষাদানের ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলাম। নূতন ব্রাহ্মণরাজ্যে শিক্ষাও শাসন উভয়ই ব্রাহ্মণের হস্তে থাকিবে। এবার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ "পুরোহিত যোদ্ধা" হইবেন।

এবার ব্রাহ্মণগণ (প্রথমকালের)Knights Templars স্বরূপ হইবেন প্রত্যেক ঋষিরাজা, "Pontiff-king" পরশুরাম স্বরূপ হইবেন। আমি যেন মানসনেত্রে ভবিষ্যতের-রাজ্যে, এই নূতন ব্রাহ্মণদিগের জ্যোতির্ম্ময় উন্নত বরবপু দেখিতে পাইতেছি। আমি যেন দেখিতেছি, ভারতে নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, সংসারে কেবলমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বিদ্যা ও প্রেম গুণ ও চরিত্র আদৃত হইতেছে; অত্যাচার, হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা তিরোহিত হইয়াছে, ভারতে আদর্শ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হে বিপ্রগণ! পুরাকালে একবার জগৎ তোমাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়াছিল। জগৎ আবার তোমাদিগকে, তোমাদিগের সেই প্রাচীন গুরু-পদ গ্রহণ করিবার জন্য, আহ্বান করিতেছে। শ্রীমতি বিশান্তা (Besant) শ্রীমতি ব্লাভাট্স্কি

(Madame Blavatsky) কর্ণেল অল্কট, শ্রীযুক্ত সিনেট প্রভৃতি মহাত্মাগণ ইহার প্রমাণ। হিন্দুর আধ্যাত্মিক মন্ত্রে ইংলণ্ড,ফরাশি, জর্ম্মনি ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ শনৈঃ শনৈঃ দীক্ষিত হইতেছে। এবার সমুদায় জগৎ হিন্দু হইবে। এবার ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব জগদ্ব্যাপী হইবে। এবার সমুদায় জগৎ নব-ব্রাহ্মণরাজ্যে পরিণত হইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! সেই গৌরবময় রাজত্বের জন্ম প্রস্তুত হও।

মর্ম্ম।

জাতিভেদ বিষয় যাহা লিখিলাম তাহার সার এই যে—

১। জাতিভেদ প্রাচীনকালে যে আকারে ও যে অবস্থার ছিল, তাহাতে তাহার প্রয়োজন ও উপকারিতা ছিল।

২। বর্ত্তমানকালে জাতিভেদ প্রথা যেরূপ বিকৃত ও অঙ্গ-হীন হইয়াছে, তাহাতে তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়োজন ও উপকারিতা নাই।

৩। ইংরাজশাসনে, বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাচীন কৌলিক জন্মগত জাতিভেদ পুনরুদ্ধার করিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। তাই, এখন জ্ঞানী গুণী ও সাধু ব্যক্তিমাত্রকেই ব্রাহ্মণ মানিয়া, এক প্রকার নূতন জাতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য সংস্থাপন করিতে হইবে।

চাকুরি

প্রভু ও ভৃত্য।

আমাদের সেই নগর প্রান্তস্থিত উদ্যান—অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আভায় গাছের পাতা রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র গাছে জমিয়া কলরব করিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। একটী ক্ষুদ্র বালক কখন বা ফল তুলিতে ছুলিয়া দুলিয়া দৌড়িতেছে, কখন বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। বাগানী কাজ করিতেছে। সম্মুখে গৃহস্বামী দণ্ডায়মান, সেই দেবমূর্ত্তির কনক-কান্তিতে উদ্যানের শোভা যেন আরও ফুটিয়াছে। সেই মহিমাময় দেহ যেন পবিত্র পুষ্পচয়ে রচিত, অথচ কেমন দৃঢ় গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। চরিত্রের রাজশ্রী মুখে কেমন বিভাষিত। গৃহস্বামী মালীকে বলিলেন, "তোমার কাজ আজ ভাল হয় নাই, আমি তোমার কাজে অদ্য অসন্তুষ্ট হইয়াছি।" মালী পরিণত বয়স্ক, নূতন এই বাগানে লাগিয়াছে, অধিক কথা কহে না, নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া চলিয়া যায়। মালী প্রশান্তভাবে উত্তর করিল, "মহাশয় আমার ধর্ম্মে যেরূপ বলে, সেইরূপ আমি কাজ করিয়াছি, আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আপনার যদি অনুমতি হয়, কল্য হইতে আমি আর কাজ করিতে আসিব না।" গৃহস্বামী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "আচ্ছা"। মালী সে দিন কাজ করিয়া সায়াহ্নে বাটী যাইল। তাহার পর দিন আর আসিল না। গৃহস্বামী নিজে স্বাধীন-

চেতা ও তেজস্বী, নিজে বহু সম্মান ও প্রভুত্বের পদ প্রভুর ঈষৎ অসন্তোষ বাক্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ব্যক্তি, তেজস্বিতার আদর করেন। গৃহস্বামী জানিতেন, মালী অতিশয় দরিদ্র, তাহার স্ত্রী আছে, সে রোজগার না করিলে তাহার সংসার চলে না। তথাপি সে কাজে আর আসিল না। অন্য কোন স্থানে কাজেও লাগে নাই। নিজের কুটীরে বসিয়া আছে। গৃহস্বামী তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে আসিল। গৃহস্বামী বলিলেন, "তুমি আমার কাছে থাকিবে না কি?" মালী প্রশান্তভাবে বলিল, "আপনি দয়া করিয়া রাখিলেই থাকি।" "হাঁ তুমি থাক। আমি বুঝিয়াছি, তুমি খাটী লোক।" তাহার পর সেই মালী যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন সেই মুনিবের নিকটই সম্মান ও আদরের সহিত চাকুরি করিয়াছিল।

সে জাতিতে চণ্ডাল, বড়ই দরিদ্র, তখন বয়স হইয়াছিল, যৌবনের সামর্থ্য তখন ছিল না। তথাপি মনের তেজ যাইবার নহে। ষোল আনা খাটিত, বৃথা বাক্য ব্যয় করিত না, কিন্তু কাহারও, মুনিবেরও চড়া কথা সহ্য করে নাই। কেহ কখন তাহাকে চড়া কথা বলিলে, তাহার প্রশান্ত, দৃঢ়, অথচ শিষ্ট উত্তরে তখনি বুঝিতে পারিত যে, মূর্খ "ছোট লোক" হইয়াও সে ভদ্র লোক, দরিদ্র হইয়াও তেজস্বী, চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণ, ভৃত্য হইয়াও প্রভু। অনেক দিন হইল সেই মালী মরিয়া গিয়াছে। যে বৃক্ষগুলি সে রোপণ করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও এখন নাই। তথাপি মানসনেত্রে সেই ভৃত্যের প্রশান্ত তেজস্বিতা, অনুকরণীয় মহত্ব, আমার হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছে।

তবে কে বলে, চাকুরিতে নীচতা, অনতিক্রমণীয় ভাবে সংলগ্ন আছে? চাকুরিতে নীচতা নাই। নীচতা লোভে, নীচতা ভয়ে নীচতা প্রভুর কাছে মান বেচিয়া টাকা উপার্জ্জন করা। নীচতা, পাছে চাকুরি যায়, এই ভয়ে মনুষ্য মাত্রই যে সম্মানের অধিকারী, তাহা ত্যাগ করা। নীচতা, দেহের বিকাশের জন্য মনকে সঙ্কুচিত করিয়া টাকা রোজগার করা। নতুবা চাকুরিতে কিছুমাত্র নীচতা নাই। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, প্রভু, ভৃত্য অপেক্ষা অধিক মাননীয় নহে। প্রভু টাকা দেন, ভৃত্য তাহার বিনিময়ে কাজ দেন। প্রভু হয়ত গণ্ডমূর্খ—পিতার সঞ্চিত টাকা চাকরকে দিতেছেন, ভৃত্য নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বল দিতেছেন। প্রভুর টাকার অপেক্ষা ভৃত্যের কার্য্যের কম মূল্য, কে বলিল? প্রভুও দান করিতেছেন না, ভৃত্যও দান করিতেছেন না—কেবল বিনিময় মাত্র। এক জন একটী দোকান করিল, দোকান চালাইবার জন্য এক জন চাকর রাখিল। তাহাতেই কি দোকানী তাহার চাকরের অপেক্ষা বড়লোক হইল? ধর, দোকানী মাসিক বেতন না দিয়া চাকরকে বলিল, "দেখ, তুমি লাভের অর্দ্ধেক পাইবে। আমার মূলধন, তজ্জন্য আমি লাভের অর্দ্ধেক পাইব, তোমার পরিশ্রম, তুমি তজ্জন্য লাভের অর্দ্ধেক পাইবে।" চাকর এখন অংশীদার। বুঝিয়া দেখিলে, চাকর সকল সময়ই প্রভুর অংশীদার—প্রভুর সাহায্যকারী মাত্র। ধর, আমি ধনী জমীদার, তুমি আমার শিক্ষিত কর্ম্মচারী—এখানে আমি নিজে একক যদি সমুদয় কর্ম্ম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কর্ম্মচারী রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, রাখিতামও না। অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন,

তাই তোমাকে চাহি। আমার সুবিধার জন্ত তোমার বিদ্যা বুদ্ধি চাহি, তুমি তোমার নিজের সুবিধার জন্ত বিদ্যা বুদ্ধির বিনিময়ে আমার টাকা চাও। সুতরাং অর্থও বিদ্যার বিনিময় মাত্র। শিক্ষিত কর্ম্মচারী সম্বন্ধে যে যুক্তি, অশিক্ষিত খানসামা ইত্যাদি সম্বন্ধেও সেই যুক্তি খাটে এবং সেখানেও চাকুরি বিনিময় মাত্র, সাহায্য প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে সাহায্য দান মাত্র। যখন চাকরের সংখ্যা অধিক, মুনিবের সংখ্যা কম, তখন মুনিবের গৌরব অধিক। যখন চাকরের সংখ্যা কম, মুনিবের সংখ্যা অধিক, তখন চাকরের গৌরব অধিক। এখন, বিশেষতঃ মফঃস্বলে, দিন দিন চাকর চাকরাণী দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, তাই চাকর চাকরাণীর গৌরব দিন দিন অধিক হইতেছে। এমন কি, অনেক স্থানে মুনিব তাহাদের অপমান করা দূরে থাকুক, তাহারা মুনিবকে অপমান করিয়া তাহার পর দিন আর কাজে আসে না। আমার পরিচিত একটী রায় বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাটীর একজন দাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত অতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কলহ করে, এবং তাহার পর দিন আসে নাই। তাহার মত কার্য্যে সুপটু অন্য একটী দাসী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, তাহাকে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পর দিন ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি কাজ কর। (হাঁসিতে হাসিতে) তুমি আবার আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিও।" তুমি হয়ত বলিবে, "সামান্ত একটা চাকরাণীর আস্পর্দ্ধা কত দেখ।" চাকরাণীর আস্পর্দ্ধা নহে, Law of Supply and demand, প্রয়োজন অপেক্ষা আয়োজন কম। প্রয়োজন মত দাসী পাওয়া কঠিন, তাই দাসীর এখন এত আদর।

বুঝিয়া দেখিলে সংসারে কেহ কাহারও প্রভু নহে, কেহ, কাহারও ভৃত্য নহে। এক মাত্র প্রভু ভগবান, কেবল তাঁহারই ভৃত্য আমরা সকলে। মানুষ মোহে যখন অন্ধ হয়, তখনই সে আপনাকে কাহারও প্রভু মনে করে। তথাপি কোনও মানুষকে যদি প্রভু বলিতে চাহ, তবে তাঁহাকে প্রভু বলিও, যিনি আপনার রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছেন—যিনি লোভে ভয়ে মোহে যখন অভিভূত হন না—যিনি আত্মাকে হৃদয়ের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন,—যিনি মনুষ্য মাত্রতেই নারায়ণের অংশ দেখিয়া ভৃত্যকেও সম্মান ও ভক্তি করেন। তিনিই প্রভু,—যাঁহার হৃদয়স্বরূপ জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রে, ভালবাসার মহোৎসবে, প্রভু ও ভৃত্যের, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের, মিত্র ও শত্রুর মধ্যে ভেদ নাই, সকলই একাকার, প্রেমের প্লাবনে সকলই একাকার, সকলই প্রাণের ভাই। তাই চৈতন্যদেব প্রভু।

আমি চাকুরিকে বিনিময় বলিয়াছি। টাকার ও শ্রমের বিনিময়—অথবা ভূতকালের শ্রমের (অর্থাৎ ভূতকালের শ্রমে অর্জ্জিত টাকার) এবং বর্ত্তমান কালের শ্রমের বিনিময়। আমার অর্থ এমন নহে, চাকুরিতে কেবল অর্থ ও শ্রমের বিনিময় মাত্র থাকা উচিত। না, ইহার সহিত হৃদয়ের বিনিময় থাকা উচিত। প্রভু ও ভৃত্যের ভিতর এদেশে পূর্ব্বে যে একটী পারিবারিক ভাব ছিল, একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তা ছিল, তাহা বিলাতী সভ্যতার হেয় অনুকরণে নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ধোপা নাপিত ভাণ্ডারী প্রভৃতি যেন পরিবারের মধ্যে গণ্য হইত। তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা হইত না। মামা, দাদা, খুড়া

প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান হইত এবং তাহা বলিয়া ডাকা হইত। আমি এবং আমার সহোদরগণ বাল্যকালে বাটীর গোয়ালা ভাণ্ডারিকে "গিরীশদাদা" বলিয়া ডাকিতাম মনে আছে। গিরীশদাদাকে আমরা খুব ভয় করিতাম, ও সম্মানও করিতাম। তাঁহার শাসনে আমাদের বাল্যলীলার ধ্বংসপ্রিয়তা অনেকটা দমিত হইত। সে আমাদের কত ভাল বাসিত। আমাদের পরিবারের বিপদ ও অনিষ্ট নিজের বিপদ ও অনিষ্ট মনে করিত। এ বিষয় আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুস্তকে পড়িয়াছি যে, কর্ত্তারা চাকরদিগকে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাহাদের সন্তানগণকে কোলে লইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, নব্য বাবুরা কুকুর কোলে করিতে পারেন, কিন্তু চাকরের পুত্র কখন কোলে করিতে পারেন না, যেন কোলে করিলে দেহ অশুচি হয়। প্রভু ও ভৃত্যে আজি কালি হৃদয়ের বিনিময় নাই। বড় দুঃখের বিষয়। আজ কাল—কাজ করিলে টাকা দিলাম চুকিয়া যাইল,—ভাব এই রকম। এটা একটা সামাজিক বিকার। টাকাতে ঋণ শোধ হয় না। টাকার সম্বন্ধ ছাড়া আরও সম্বন্ধ আছে, তাহা উচ্চতর পবিত্র সম্বন্ধ।—"We have profoundly forgotten everywhere that *Cash-payment* is not the sole relation of human beings; we think nothing doubting, that *it* absolves and liquidates all engagements of man." প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে সখা—উভয় উভয়ের মঙ্গলের জন্য দায়ী। প্রত্যেক প্রভুর জানা উচিত, ধনে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ক্রয় করা যায় না, ধনে শ্রম ক্রয় করা যায় মাত্র। এমন কি, ধনবিতরণ করিলেও ভালবাসা

পাওয়া যায় না। ভালবাসা, ভক্তি, হৃদয়ের ধন। হৃদয় না দিয়া কেমন করিয়া তাহা পাইবে?

"স্বর্গের জ্যোতি যাহা
মৃত্তিকায় কেমনে রচিবে তাহা।"

"ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"

একটা গল্প আছে, মিলিসে নামক একজন ধনী ব্যক্তি খুব দান খয়রাৎ করিত, লোক জনকে খুব খাওয়াইত। গৃহে নিত্য ভোজ দিত। তথাপি সে দেখিল, কেহ তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিত না। সে বিষণ্ণ হইয়া জেরুজিলামে জ্ঞানী সালিমান সম্রাটের নিকট গিয়া এই কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিল। প্রবুদ্ধ সালিমান কেবল মাত্র বলিলেন, "যাও, ভালবাসিও"। যার হৃদয়ে ভালবাসা নাই,সে প্রভু হউক, ভৃত্য হউক, সে একটা পশু বিশেষ। এমন ভীষণ নরহত্য নাই যে, সে তাহা করিতে পারে না। আর যাঁহার হৃদয় ভালবাসার বীণানিক্বণে নিত্য সঙ্গীতময়, ভৃত্য হইলেও সে বৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রভুর প্রসাদে নিত্য নিত্য নূতন প্রভুত্ব লাভ করিতেছেন। জগতে যিনি হৃদয়ের সহিত বহুলোকের সেবা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রভু,--যিনি লক্ষ জনের পদরেণু, প্রেমে ভক্তিভরে প্রণতশিরে, বহন করেন তিনি যথার্থই লক্ষপতি,—যিনি মহাসেবক, তিনিই মহাপ্রভু।

গরিব সেবা।

১। হিরণ্ময় রাজার উপাখ্যান।

"দানমেকং কলৌ যুগে"

পৃথিবীতে যে নিতান্ত নীচ ও অন্ত্যজ, সেও নিজের গরজে টাকার জন্য ধনীর সেবা করে। কিন্তু গরিবের সেবা কয় জন করিতে প্রস্তুত? ধনীর সেবা করিয়া টাকা পাওয়া যায়, গরিবের সেবা করিয়া ত টাকা পাওয়া যায় না। বিনা বেতনে কে চাকুরি করিবে? গরিবের দুঃখ মোচনস্বরূপ গরিবের সেবাস্বরূপ যে চাকুরি তাহাতে মাহিনা পাইবার ত আশা নাই, অথচ বিলক্ষণ মেহনত আছে। ইহাতে টাকা পাইবার ত কথা নাই, পার ত টাকা দিতে হইবে। এইরূপ চাকুরিতে কে স্বীকার আছ ভাই? এইরূপ চাকুরিতে কেহ আমাকে লাগাইয়া দিতে পার, ভাই? অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি; এইরূপ একটী চাকুরি করিব। কিন্তু পাপ মন এক পা বা এগোয় দুই পা বা পিছোয়। মনে এই বিষয় তোলাপাড়া করিতে করিতে দিন যে ফুরাইল, পরমায়ু যে নষ্ট হইল! গরিবের চাকুরি; দীনজনের সেবা আমরা করিব, এমন কি ভাগ্য করিয়াছি? দুঃখীর দুঃখমোচন করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব। গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন ঈশা। গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন চৈতন্য। তুমি আমি ভাই গরিবের চাকুরি করিব এমন ভাগ্য কি করিয়াছি? গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন উইলবার্ফোর্স। গরিবের চাকুরি করিয়াছিলেন দেবী কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

গরিবের চাকুরি করিতেছেন, মুক্তিসেনার অধিনায়ক জেনারেল বুথ। গরিবের দুঃখমোচন ব্রত, গরিবের চাকুরি, বড়উচ্চ চাকুরি, বড় কঠোর ব্রত, অতি মহতী সেবা। ইহা মুক্তির পথ স্বর্গের দ্বার। গরিবের চাকুরি যে রাজাধিরাজের চাকুরি। কোন ব্যক্তিবিশেষের চাকুরির চেয়ে গবর্ণমেন্টের চাকুরি ভাল। গবর্ণ-মেন্টের চাকুরি অপেক্ষা গরিবের চাকুরি অযুতগুণে শ্রেষ্ঠ। কেন না গরিবের চাকুরি পরব্রহ্ম নারায়ণের চাকুরি। গরিবকে দুটা অন্নদেওয়াতে স্বয়ং নারায়ণকে "ভোগ" দেওয়া হয়। এই ভোগে নারায়ণ যেমন তুষ্ট হন তেমন আর কোনও ভোগে নহেন। এখানে একটা কথা বলি। হিরণ্ময় নামে এক রাজা ছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য তাঁহার মন বড় আকুল হইল। কবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব, রাজা দিনরাত্রি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। একদিন সকালে সূর্য্য কেবল উঠিয়াছে, তাহার লাল আলোতে রাজ বাড়ী, গাছের পাতা, দূরে মন্দিরের চূড়া, সব সোণার মত চিক্‌মিক করিতেছে, নীচে সবুজ ঘাসের উপর পবিত্র শিশির বিন্দু সূর্য্যের আভায় হীরার মত নানা রঙ্গে জ্বলিতেছে। ফুলগুলি যেন তাহা দেখিয়া ছোট ছেলের মত হাঁসিয়া হাসিয়া বাতাসের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, বাতাস ফুলের সুগন্ধ গায় মাখিয়া এদিকে ওদিকে আস্তে আস্তে চলিয়া লোককে সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে, আকাশে পাখিরা গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। এই প্রাতে সকলেই সুখী। কিন্তু হিরণ্ময় রাজার সুখ নাই। অদ্যাপি ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। রাজবাড়ীতে ভগবানকে পাওয়া যাইল না। রাজা মনে করিলেন "অদ্যই আমি এই অট্টালিকা

ত্যাগ করিব, দেশে দেশে ফিরিব, ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করিবই"।—একাকী গম্ভীর ভাবে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি রাজবাড়ী হইতে বাহির হইলেন। নগরের প্রান্তে যখন আসিলেন, সম্মুখে দেখেন, এক জন রোগা খোঁড়া কুষ্ঠরোগী। সে কাতরাইয়া বলিল, "বাবা, লাচারকে কিছু ভিক্ষা দিন, ক্ষুধায় মরিতেছি"। রাজা দেখিলেন সেই ভিক্ষুকের গা হইতে মাংস পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে; বড়ই বিভৎস দৃশ্য যেন সেই প্রাতঃ-কালের রাঙ্গা চিক্‌চিকে আভার উপর, কি একটা বিশ্রী কালিমা পড়িয়াছে। রাজা নাকে কাপড় দিয়া, তাহারদিকে একটা মোহর কৈ করিয়া ফেলিয়া দিয়া চট্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। তাহার পর হিরণ্ময় দেশে দেশে কত কাল ফিরিলেন, দূরে আরও দূরে বিজন বনে, উচ্চ পর্ব্বতে, জনাকীর্ণ নগরে, গ্রামে, প্রান্তরে কতস্থান ঘুরিলেন, ভগবানের উদ্দেশে—কিন্তু কোথাও ভগবানের দেখা পাইলেন না। কেবল দেখিলেন, মানুষের অত্যাচার, নির্ম্মমতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি। দেখিলেন, কত বড় মানুষ টাকা নষ্ট করিতেছে; নাচ তামাসা বাজিতে, বদ্‌ খেয়ালে পাপ কাজে কত টাকা নষ্ট করিতেছে; নরদামার ভাত ফেলিয়া দিতেছে তবু নিকটে যে গরিব না খাইতে পাইয়া তিলতিল মরিতেছে, তাহাঁকে ডাকিয়া এক মুটা অন্ন দিতেছে না। ইহা দেখিয়া রাজার মনে হইল "ইহাই বুঝি ঘোর কলির আবি-র্ভাব। যাহা হউক ভগবানের ত দয়া হইল না, তিনি দেখা দিলেন না। আর পথে পথে ফিরিয়া কি হইবে। যাই, বাটী ফিরিয়া যাই। রাণীও কুমারকে অনেক দিন না দেখিয়া মন বড়ই আকুল হইয়াছে"। রাজা বাটী ফিরিলেন। কাঁধে ভিক্ষার

ঝুলি,হাতে একটী ঘটী,পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে,রাত্রির শিশিরে, রাজার মুখে কালিমা পড়িয়াছে, কপালে দাগ বসিয়াছে, চুল কটা ও রুখু রং কাল হইয়াছে। হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায় দড়ির মত শির উঠিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইব যাইব হইয়াছে, এমন সময়ে রাজা রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন, আর এক ব্যক্তি রাজা হইয়াছে। দ্বারবান তাঁহাকে চিনিল না। কড়া দ্বারোয়ানি সুরে তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত হিরণ্ময় রাজা অগত্যা ফিরিলেন। তাঁহাকে কেহ চিনিল না, মানিল না। তিনি আস্তে আস্তে নগরের বাহিরে আসিলেন। রাত হইল, আকাশ রাশি রাশি কাল মেঘে ঢাকিয়া গেল, ঝড় উঠিল,কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। বড় বড় ফোটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। হায়! রাজা হিরণ্ময়ের কি হইবে। মাথার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি যাইল, আকাশ পরিষ্কার হইল। নিকটে দেব মন্দির, সেই খানে রাত কাটাইবেন, মনে করিলেন। কিন্তু বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। নিকটে নদী বহিয়া যাইতেছে। সেই নদীর ঘাটে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে একটী মাত্র ফল ছিল। তাহা বাহির করিয়া খাইলেন, এমন সময় সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। সে আবার কাতর স্বরে ভিক্ষা চাহিল। রাজা হিরণ্ময় এখন স্বয়ং ভিক্ষুক। ভিক্ষুকে ভিক্ষুকে ভাই ভাই ভাব। এখন আর সে ঘৃণার ভাব নাই। হিরণ্ময় সেই ফলটি ভাঙ্গিয়া তাহার আধখানি এবং নদী হইতে জল আনিয়া ভিক্ষুককে দিলেন। ভিক্ষুকের খাওয়া হইলে নিজে ফলের অপর আধখানি খাইলেন। ইতিমধ্যে, দেখ, সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য আলো হইয়া উঠিল,

সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন। সে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল। সত্যই দেখিতেছি যে ইনি দেবতা। সেই আলো আরও আলোকময় হইল, সেই আলোর ভিতরে সেই মূর্ত্তি আরও শোভা পাইতে লাগিল। তাহার লাল আভায় চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া যাইল। তখন সেই দেবতা বলিলেন ঃ—

"দেখ,—হিরণ্ময়,তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্ত দেখিয়াছিলে, সেই আমি ভগবান্। তুমি রাজবাটী ত্যাগ করিবার সময় দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্তকে নাক সিটকাইয়া ঘৃণার সহিত যে একটি মোহর দান করিয়াছিলে, সে আমাকে দিয়াছিলে, কিন্তু সে দান আমি লই নাই। কেননা প্রকৃত পক্ষে সে দান করা হয় নাই, সে কেবল আমার প্রতি ঘৃণা, অপমান প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঘৃণার সহিত যে দান করা যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরককুণ্ডে পাপের আহুতি। দয়াতে গলিয়া শুদ্ধ মনে যে দান করা যায়, যে দানের সহিত হৃদয় মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহাই দান, তাই পুণ্যদাতা, দয়া ও স্নেহে, গরিবকে যে অন্ন দেন, তাহাতে আমাকে ভোগ দেওয়া হয়। ঐ যে নিকটে মন্দির দেখিতেছ, উহাতে যে এত জাঁক করিয়া প্রত্যহ অতি উপাদেয় ভোগ দেওয়া হয়,তাহা আমি লই না, তাহাতে আমি তুষ্ট নহি। কিন্তু গরিবকে যে অন্ন দান করা হয়, বৈকুণ্ঠধামে তাহা আমার নিকট পঁহুছে। সুতরাং গরিবকে যিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে গরিবকে আমাকে এবং নিজেকে এই তিন জনকে খাওয়ান— কেননা তাহাতে গরিবের দুঃখ দূর হয় আমাকে ভোগ দিয়া পূজা করা হায়, এবং নিজের আত্মার পরিপুষ্টি ও পুণ্য সঞ্চার হয়।

তোমরা এতকাল শুনিয়া আসিয়াছ,—"ব্রাহ্মণের মুখ, জলবিহীন কণ্টক শূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে, এবং সেই কৃষিই সর্ব্বাভিলাষপরিপূরিকা।" অদ্য আমি বলিতেছি, "দরিদ্রের মুখ জলবিহীন কণ্টক শূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে এবং সেই কৃষিই সর্ব্ব-কামনা পরিপূরিকা"।

গরিবের মুখস্বরূপ মাঠে অন্নদানস্বরূপ যে বীজ বুনিবে তাহাতে সোনা ফলিবে, সেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ মোক্ষ ফসল নিরুপ-দ্রবে নিষ্কণ্টকে পাইবে, নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে। তাই "সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা।" তোমরা শুনিয়াছ "দানমেকং কলৌ-যুগে" অর্থাৎ কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম। সে যে দান, সেই এই দান গরিবকে দান, দয়ার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, স্নেহের সহিত দান। যে দুঃখী সেই গরীব, যে পীড়িত সেই গরীব। এবং দয়ায় ডুবিয়া, ভালবাসায় মজিয়া, দুঃখ মোচন করার নাম দান। দুঃখীমাত্রেরই দুঃখ মোচন করার নাম গরিবকে দান। হে হিরণ্ময়, তুমি ভক্তিযোগে, দানমাহাত্ম্য, গরিবের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছ। তাই তোমার নিকট আমি আমাকে প্রকাশ করি-লাম। যাও, অদ্য হইতে তোমার নাম ভক্তিময় হইল। যাও, তোমার রাজ্য, তুমি ভক্তের হৃদয়ের সহিত শাসন কর, নিজের ছেলের মত গরিবদিগকে প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল। ভক্তিময় রাজা দেখিলেন, অগণ্য লোক আলো জ্বালাইয়া, নিশান উড়াইয়া, ফুল চন্দন মালা হাতে করিয়া, শাঁক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে, এক অতি চমৎকার হাওদা লইয়া তাঁহার দিকে

সেই কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলোকের ভিতর দেখিতে পাইলেন। সে ক্ষণকালের মধ্যে সুন্দর দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল। সত্যই দেখিতেছি যে ইনি দেবতা। সেই আলো আরও আলোকময় হইল, সেই আলোর ভিতরে সেই মূর্ত্তি আরও শোভা পাইতে লাগিল। তাহার লাল আভায় চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া যাইল। তখন সেই দেবতা বলিলেন :—

"দেখ,—হিরণ্ময়,তুমি যাহাকে দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্ত দেখিয়াছিলে, সেই আমি ভগবান্। তুমি রাজবাটী ত্যাগ করিবার সময় দরিদ্র কুষ্ঠগ্রস্তকে নাক সিটকাইয়া ঘৃণার সহিত যে একটি মোহর দান করিয়াছিলে, সে আমাকে দিয়াছিলে, কিন্তু সে দান আমি লই নাই। কেননা প্রকৃত পক্ষে সে দান করা হয় নাই, সে কেবল আমার প্রতি ঘৃণা, অপমান প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঘৃণার সহিত যে দান করা যায়, সে দান নহে, সে পাপ, নরককুণ্ডে পাপের আহুতি। দয়াতে গলিয়া শুদ্ধ মনে যে দান করা যায়, যে দানের সহিত হৃদয় মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহাই দান, তাই পুণ্যদাতা, দয়া ও স্নেহে, গরিবকে যে অন্ন দেন, তাহাতে আমাকে ভোগ দেওয়া হয়। ঐ যে নিকটে মন্দির দেখিতেছ, উহাতে যে এত জাঁক করিয়া প্রত্যহ অতি উপাদেয় ভোগ দেওয়া হয়,তাহা আমি লই না, তাহাতে আমি তুষ্ট নহি। কিন্তু গরিবকে যে অন্ন দান করা হয়, বৈকুণ্ঠধামে তাহা আমার নিকট পঁহুছে। সুতরাং গরিবকে যিনি খাওয়ান, তিনি তাহাতে গরিবকে আমাকে এবং নিজেকে এই তিন জনকে খাওয়ান— কেননা তাহাতে গরিবের দুঃখ দূর হয় আমাকে ভোগ দিয়া পূজা করা হয়, এবং নিজের আত্মার পরিপুষ্টি ও পুণ্য সঞ্চার হয়।

তোমরা এতকাল শুনিয়া আসিয়াছ,—"ব্রাহ্মণের মুখ, জলবিহীন কণ্টক শূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে, এবং সেই কৃষিই সর্ব্বাভিলাষপরিপূরিকা।" অদ্য আমি বলিতেছি, "দরিদ্রের মুখ জলবিহীন কণ্টক শূন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিবে এবং সেই কৃষিই সর্ব্ব-কামনা পরিপূরিকা"।

গরিবের মুখস্বরূপ মাঠে অন্নদানস্বরূপ যে বীজ বুনিবে তাহাতে সোনা ফলিবে, সেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ মোক্ষ ফসল নিরুপদ্রবে নিষ্কণ্টকে পাইবে, নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে। তাই "সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা।" তোমরা শুনিয়াছ "দানমেকং কলৌযুগে" অর্থাৎ কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম। সে যে দান, সেই এই দান গরিবকে দান, দয়ার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, স্নেহের সহিত দান। যে দুঃখী সেই গরীব, যে পীড়িত সেই গরীব। এবং দয়ায় ডুবিয়া, ভালবাসায় মজিয়া, দুঃখ মোচন করার নাম দান। দুঃখীমাত্রেরই দুঃখ মোচন করার নাম গরিবকে দান। হে হিরণ্ময়, তুমি ভক্তিযোগে, দানমাহাত্ম্য, গরিবের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছ। তাই তোমার নিকট আমি আমাকে প্রকাশ করিলাম। যাও, অদ্য হইতে তোমার নাম ভক্তিময় হইল। যাও, তোমার রাজ্য, তুমি ভক্তের হৃদয়ের সহিত শাসন কর, নিজের ছেলের মত গরিবদিগকে প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে বাজনা বাজিয়া উঠিল। ভক্তিময় রাজা দেখিলেন, অগণ্য লোক আলো জ্বালাইয়া, নিশান উড়াইয়া, ফুল চন্দন মালা হাতে করিয়া, শাঁক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে, এক অতি চমৎকার হাওদা লইয়া তাঁহার দিকে

আসিতেছে। তাহারা সকলে তাঁহার নিকট আসিয়া জয়ধ্বনি করিল, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজাকে সেই হাওদাতে বসাইয়া, তাহারা মৃদঙ্গ, শাঁক, ঘণ্টা ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে, ঘনঘোররোলে রাস্তায় মহানন্দের ঢেউ তুলিয়া, নৃত্য করিতে করিতে, রাজাকে রাজ-ভবনের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। রাস্তায় দুই ধারের বাড়ীর উপর হইতে সব স্ত্রীলোক হুলুধ্বনি এবং পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর দিন হইতে ভক্তিময় রাজার রাজ্য এক নূতন ভাব ধারণ করিল। যাহাদিগের অন্নকষ্ট, তাহাদিগকে অকাতরে অন্ন দান করা হইতে লাগিল। যাহারা মূর্খ, তাহারা ব্রাহ্মণই হউক, শূদ্রই হউক, তাহাদিগের শাস্ত্রে শিক্ষা দান করা হইতে লাগিল। ভক্তিময় রাজা ও তাঁহার কার্য্যকুশল পুত্রগণ প্রজাদিগের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া, তাহাদিগকে ভায়ের মত ভালবাসিয়া, তাহাদিগের সকল রকম দুঃখে দুঃখী হইয়া দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। ছোট ছেলে যেমন মা বাপের কাছে যায়, প্রজারা তেমনি রাণী রাজার নিকট যাইত এবং সেখানে গিয়া ভালবাসা, সাহায্য ও সান্ত্বনা পাইত। ভক্তিময়, দেবালয়ে যাহাতে গরীবে অন্ন পায়, বিদ্যালয়ে যাহাতে গরিবে শিক্ষা পায়, তাহার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এবং নিজে তাহা প্রতিদিন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্য ক্রমে মর্ত্ত্যে স্বর্গ্য হইয়া উঠিল।

ভক্তিময় রাজার সম্বন্ধে সাধুর * নিকট যাহা শুনিয়াছ, তাহা লিখিলাম। এই কথাটী আমার বোধ হয় প্রত্যেকের সম্বন্ধে খাটে। আমরা ছোটই হই বা বড়ই হই, পুরুষই হই বা স্ত্রী

হই, মৃণ্ময়ই হই আর হিরণ্ময় হই, আমরা সকলেই গরিবের দুঃখ মোচন করিয়া গরিবের চাকুরি করিয়া, নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে "সর্ব্বকামিকা কৃষি" কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি, কিন্তু দুঃখ এই যে, এ কৃষি কাজে যে মন আসে না। তাই মনে হয়, ধর্ম্ম যাহা, তাহা জানি, কিন্তু তাহাতে মতি গতি হয় না, অধর্ম্ম যাহা তাহাতে যে মতি গতি হয়। তাই আর উপায় না দেখিলে বলিতে হয়, হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়স্থিত হইয়া ধর্ম্ম পথে আমাকে চালনা কর। তুমি আমাকে সৎকার্য্যে নিয়োগ কর, এবং তোমার নিয়োগ মতই যেন কার্য্য করিতে পারি। গরিবের সেবাতে আমাদিগের মতি দেও। গরিব-সেবকদলের চেষ্টা ফলবতী ও কার্য্য মঙ্গলময় কর।

১। ভিক্ষাদান।

"অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।" বায়ুপুরাণ

খাঁটী রাজনীতি বা প্রজানীতিই বল, দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতাই বল, আর নিঃস্বার্থ ধর্ম্মই বল, সকলই দেশের দীন-হীন কুটীরবাসী জনরাশির ভাগ্যের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, যাহাতে তাহাদিগের উন্নতি হইল না, তাহা দেশের উন্নতি নহে। যাহাতে তাহাদিগের শিক্ষা হইল না, তাহা শিক্ষা নহে। যে

---

* ভক্তিময় (হিরণ্ময়) রাজার উপাখ্যান ভাগ মার্কিন কবি লাঙ্গোলের একটী কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

ধন বৃদ্ধিতে তাহাদিগের আহারের সংস্থানের বৃদ্ধি হইল না, তাহা ধন বৃদ্ধি নহে। যে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ভাগ অগণ্য দীনহীন জন পাইল না, তাহা সভ্যতা নহে। যে ধর্ম্ম, অগণ্য গরিব "ছোট" লোকদিগকে ক্রোড়ে স্থান দিল না, দয়ার কমণ্ডলু হাতে করিয়া, গরিব কৃষাণ ভাইয়ের প্রাঙ্গনে এক দিনও দেখা দিল না, যে ধর্ম্ম, দীন দুঃখী জনের অস্থি মাংস মজ্জারূপ ইট, চুন, সুরকি দিয়া উপাসনার মন্দির নির্ম্মাণ করিল, তাহা ধর্ম্ম নহে। এই সনাতন সত্য কথা কতবার প্রচারিত হইল, কতবার লুপ্ত হইল। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে হেনরি জর্জ্জ তাঁহার Progress and Poverty" পুস্তকে এই সত্য কথার প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজ-ক্ষেত্রে মহারথী বুথ (General Booth) তাঁহার "In Darkest England" পুস্তকে এই নূত ভাষা ঘোষণা করিয়া, দরিদ্রের ও নষ্টের উদ্ধারের জন্য, বিচিত্র সেনাদল সংগঠন করিয়া, সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব বীরত্ব ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এই সত্য কথার গূঢ় মর্ম্ম একদিন হিন্দুর জীবনের অস্থি মজ্জাতে নিহিত ছিল, এই দিনজনে দয়ামমতা হিন্দু সমাজের অন্তরাত্মা, হিন্দু সভ্যতার মূল মন্ত্র ছিল। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা দয়া বা সহযোগিতা বা Compassion এর উপর স্থাপিত ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বন্দ্ব বা প্রতি-যোগিতা বা Competition এর উপর স্থাপিত।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দেওয়াদেয়ি; আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় কাড়াকাড়ি। তবে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার দেওয়া দেয়ির ভিতর যে একটুকুও কাড়াকাড়ি ছিল না, তাহা নহে।

কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা দয়া-প্রধান অধুনিক ইউরোপীয় দ্বন্দ্বপ্রধান। হিন্দুদিগের এই দয়া প্রধান সভ্যতা, ইউরোপীয় দ্বন্দ্বপ্রধান সভ্যতার সংঘর্ষে এখন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। একদিন যে জাতির লোকে প্রতি-বেশী অভুক্ত থাকিলে নিজে অন্নগ্রহণ করিত না, অদ্য সেই জাতির নরাধম সন্তানগণ পাশের ঘরে নিজের ভাই না খাইতে পাইয়া জঠরানলে ছটফট করিলেও মুখ তুলিয়া তাকায় না। পূর্ব্বে যে জাতির কুলবধূগণ অভ্যাগত অপরিচিত অতিথির সেবা করিতে পাইলে, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, মহা-নন্দে সহাস্য বদনে রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া পরম পবিত্র সুখ লাভ করিতেন, অদ্য সেই জাতির কামিনীগণ ভাসুর দেবরকেও দুই দিন বাঁধিয়া খাওয়াইতে হইলে রোষভরে মুখ ঘোরকৃষ্ণ-কালিমাময় করে, এবং আপনার ভর্ত্তা ও ভাগ্যকে শতবার ধিক্কার দেয়। পূর্ব্বে যে দেশের লোক কৃতী ও বর্দ্ধিষ্ণু হইলেও জ্ঞাতি কুটুম্ব যাহার যেখানে অভাব আছে, সকলকে নিজের পরিবারের মধ্যে টানিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুখী করিত, অদ্য সেই দেশে নরপশুগণ বিদেশে সোহাগের পত্নীকে রত্নে বিভূষিত করিয়া, সুখ সম্ভোগে কাল কাটাইয়া বাটীতে দুঃখিনী মা, মাসী, পিসি, বা খুড়ী জেঠী অন্নাভাবে মরিল কি না তাহার খবরও লয় না। হা বিলাতী সভ্যতা, তোমার কৃপাতে কি অবশেষে আমাদের এই অবস্থা হইল! হা ইংরাজি সাহিত্য, তোমার শিক্ষার কি এই পরিণাম! হা ইউরোপীয় সভ্যতা, তুমিই কি শাস্ত্রোক্ত কলি!

যখন অকৃতী ভাইকে বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে, দুঃখিনী মা মাসী

পিসিকে ভাত দেওয়ার প্রথা দেশ ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, তখন যে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে দিবার অনিচ্ছা, সেখানে দান না করার পক্ষে যুক্তি সকল আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। "Indiscriminate Charity" নির্ব্বিশেষ দাতব্য, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ভিক্ষা দেওয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করা উচিত, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে, যে পাছে দান অপাত্রে পড়ে, তজ্জন্য একবারে দান করিবে না। ইহার অর্থ এই যে, দান করা ত কর্ত্তব্যই, কিন্তু কেবল দান করিলে কর্ত্তব্য সংসাধিত বা নিঃশেষ হইল না। দান করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দিতে হইবে। কোন্ বস্তু কাহাকে কি ভাবে কখন দান করিলে, গ্রাহকের মঙ্গল বা শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল সম্পাদন হইবে, ইহা বিচার করিয়া দান করিতে হইবে। দান করা কাহাকে বলে? অধিকাংশ স্থলে যখন প্রত্যুপকার প্রত্যাশা না করিয়া মনুষ্যকে কোন দ্রব্য বা জড়পদার্থ দেওয়া হয়, তাহাকে দান বলে।

কিন্তু কেবল দিলেই প্রশস্ত দান হইল না। ভালবাসিয়া, দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হইয়া, দান করিতে হইবে, গরিব সেবায় হিরণ্ময় রাজার গল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে দয়াহীন বা সাহানুভূতি শূন্য দান ভগবান অনুমোদন করেন না, তাহা দাতার পুণ্যকল্পে দানই নহে। সুতরাং প্রকৃত দানে কেবল জড়পদার্থ আছে তাহা নহে, তাহাতে প্রীতি আছে। আবার প্রকৃত দানে বুদ্ধি আছে অর্থাৎ পাত্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন আছে! আর দানে দাতার আধ্যাত্মিক মঙ্গল আছে। সচরাচর প্রশস্ত দান চতুরঙ্গ

(১) জড়পদার্থ দেয়), (২) হৃদয় বা প্রেম (গ্রাহকের প্রতি) (৩) বুদ্ধি বা বিচার (দাতার), (৪) আত্মা বা মুক্তি (দাতার)।

প্রশস্ত দানে চিরকালই দয়া ও মেধা, প্রেম ও প্রজ্ঞা, বাগর্থের ন্যায়, হরগৌরীর ন্যায়, সংশ্লিষ্ট। এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু যাঁহারা আজি কালি দান করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এই সত্য কথা হইতে এক অপরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা প্রকারান্তরে বলেন, পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান করিতে হইবে, এই বিচারকার্য্য কঠিন; অতএব দান করা কঠিন, সুতরাং দান না করাই ভাল।"

আবার, দানপরাঙ্মুখ শ্রেণীর কোন কোনও লোক বলেন,—কে দানের পাত্র, কে দানের অপাত্র, তাহা জানি না। আমি যে ভিক্ষুককে অন্ন দিব, সে হয় ত সমর্থ হইয়াও আলস্যবশতঃ কোন কার্য্য না করিয়া অন্নধ্বংসপূর্ব্বক সমাজকে বঞ্চিত করিবে। আমি যদি ভিক্ষুকগণকে অন্ন না দিয়া আমার সুখসম্ভোগের জন্য কোন বিলাস দ্রব্য ক্রয় বা প্রস্তুত করণার্থ, সেই অন্ন বা ধন ব্যয় করি, তাহা হইলে, ভিক্ষুকগণকে অন্ন দিলে যত জনকে অন্ন দান করা হইত, (শ্রমী) তত জনকে অন্নদান করা হইল, অথচ তাহার উপর আমার একটা বিলাসের দ্রব্য প্রস্তুত হইল; এবং সেই পরিমাণে সমাজের ধন বৃদ্ধি হইল। অর্থাৎ আমি যদি দুই শত মণ অন্ন ভিক্ষুককে দেই, তাহাতে যত লোক খাইতে পারিবে, আর তাহা না করিয়া যদি দুইশত মণ অন্নে লোক খাটাইয়া, আমার একটা বিলাসসামগ্রী করিয়া লই, তাহা হইলেও সমান লোক খাইতে পারিবে।

এই তর্কে হঠাৎ বাঁধা লাগিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা

যদি সত্য হইত, তাহা হইলে ভোগী ও ত্যাগীর উভয়ের দ্বারা গরিবদিগের তুল্য উপকার হইত, অথবা ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীর দ্বারা অধিক উপকার হইত। তাহা হইলে বিলাস ভোগহুতাশনে যত অধিক পরিমাণে বিলাসদ্রব্যের আহুতি দিবেন,তত অধিক পরিমাণে (বিলাস দ্রব্য নির্ম্মাতা) শ্রমীদিগের মুখে খাদ্য বর্ষিত হইত। যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে বিলাসের কোমল কুসুমাস্তৃত সহজ সোপান দিয়া, ধনী বিলাসীগণ অনায়াসে ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশ করিতে পরিতেন। কিন্তু বিলাসীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে এই মতটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। উদাহরণ দ্বারা এই ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি।

ধরুন—সংযমী রামের ২০০ বিঘা জমী আছে, তাহাতে ৮০০ মণ চাউল উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ২০০ মণ চাউল তিনি ভিক্ষুকদিগকে দান করেন। রামের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র শ্যাম ঐ ২০০ বিঘা জমী পাইলেন।

শ্যাম কিন্তু বিলাসী। তিনি ভিক্ষা দেওয়া একবারে বন্ধ করিলেন, এবং আদেশ দিলেন যে, আমি ৮০০ মণ চাউল চাহি না। ৬০০ মণ চাউল চাহি এবং ২০০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে রেশম চাহি। সুতরাং এখন ১৫০ বিঘা জমীতে চাউল উৎপন্ন হইতে লাগিল, এবং বাকী ৫০ বিঘাতে তুঁতের আবাদ হইতে লাগিল।

এখন দেখুন, রামের সময় রামের জমীতে যাহারা চাস করিত, তাহারা তখন যেমন খাইতে পাইত,শ্যামের সময় এখনও তাহারা তেমনি খাইতে পাইতে লাগিল। কিন্তু ভিক্ষুকগণ, ত্যাগী রামের সময় খাইতে পাইত, ভোগী শ্যামের সময়

মোটেই খাইতে পারে না। তবেই, এখানে শ্যামের রেশম উৎপাদন করাই ভিক্ষুকগণের অনাহারের কারণ, ইহা বুঝা যাইতেছে।

সুতরাং আমরা এখানে দেখিতেছি যে, ভিক্ষুকগণ সম্বন্ধে ২০০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে রেশম উৎপাদন করাও যাহা, আর ২০০ মণ চাউল গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়াও তাহাই। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করায় মোটের উপর লোককে বর্দ্ধিত আহার দেওয়া হয় না, লোককে আহার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কেহ কেহ আমার এই মীমাংসার আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,—

"ধরুন্ রামের সময় যেমন সমুদয় জমীতে ধানের চাষ হইত, শ্যাম তাহা বজায় রাখিলেন, অথচ সমুদয় জমীতে ধানেরই চাষ করিতে লাগিলেন। রাম যেমন ভিক্ষুকদিগকে ২০০ মণ চাউল দিতেন, শ্যামও তাহাই দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিক্ষুক-দিগের দ্বারা তিনি এখন রেশম প্রস্তুত করাইয়া লইতে লাগি-লেন। এস্থলে খাদ্যের পরিমাণ কমিল না, ভিক্ষুকগণ পূর্ব্বে যেমন খাইতে পাইত, এখনও সেই পরিমাণে খাইতে পাইতে লাগিল, কিন্তু এখন আর ভিক্ষুক থাকিল না, এখন শ্রমী হইল। আর বাড়ার ভাগে, একটা নূতন দ্রব্য অর্থাৎ রেশম প্রস্তুত হইল। ইহাতে গরিব লোকের খাদ্যের পরিমাণ না কমিয়া গিয়া, ধনীর বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত হইল।"

ইহার উত্তর,—শ্যাম যদি তাঁহার সমুদয় জমীতে রামের ন্যায় ধান্যের আবাদ করেন, তাহা হইলে অবশ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা খাদ্যের পরিমাণ কমে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্যাম যদি

তাঁহার সমুদয় জমীতে ধান্তের চাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রেশমের জন্য তুঁতের আবাদ হইবে কোন্ জমীতে? গাছ ছাড়া রেশম হয় না। জমী ছাড়াও গাছ হয় না। গাছ কেন যে কোন দ্রব্য চাহ, তাহার উৎপাদনের জন্য মূলে জমীর আবশ্যক। সুতরাং বিলাস ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে পরিমাণে সমাজে বিলাসোপকরণ বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। 'সভ্যতার' বা 'উন্নতির' সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিলাসিতা আসিয়া প্রবেশ করে। বিলাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শস্যক্ষেত্র হ্রাস করিয়া, বিলাসক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়, খাদ্যের পরিমাণ কম হইয়া যায়, ঘোর দারিদ্ররূপী রাক্ষস নরনারীগণকে গ্রাস করে। এই জন্য (কতিপয়ের) "উন্নতির" সঙ্গে সঙ্গে (বহু লোকের) "দুর্গতি" প্রকটিত হয়।

একে ত যে পরিমাণে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, সেই পরিমাণে উর্ব্বর ক্ষেত্র পাওয়া কঠিন। তাহার উপর আবার যে উর্ব্বর ক্ষেত্র পাওয়া যায়, তাহাতে যদি শস্য উৎপাদন না করিয়া বিলাস দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে শস্যের বিশেষ অনাটন হইবে, ইহা অতি সহজ কথা। এইরূপ শস্যের অনাটন হইলে ভিক্ষুকগণের ভিক্ষা দেওয়া দূরে যাউক, কতক শ্রমীদিগের অন্ন দান করা যায় না, শ্রমীরা কাজ পায় না। কতক শ্রমী কার্য্য প্রাপ্তি প্রতীক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া আছে, কেহ তাহাকে ডাকিতেছে না; কতক মজুর রোজ খাটিবার জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ তাহাদিগকে লইতেছে না। বিলাস-

প্রাণ সভ্যতাপীড়িত ইউরোপে আজি অনেক লোকের এই দশা ঘটিয়াছে। তাই সেখানে শ্রমচ্যুত ক্ষুধার্ত্ত গরিবগণ দল বাঁধিয়া সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং প্রতিদিন খুন খারাপি হইতেছে। ইহা দ্বন্দ্ব বা Competition প্রধান সভ্যতার ফল। তাই এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আসুন, আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের দয়া প্রধান সভ্যতার দিকে ফিরিয়া যাই। এই দয়া প্রধান সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ ভিক্ষা দান বা অন্ন দান। পরাশর বলেন,—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্দ্দানমেকং কলৌযুগে॥

কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার দানের মধ্যে অন্ন দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান নাই। তাই আমরা বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই,—

"অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।"

অন্ন লোকের প্রাণ, অন্ন লোকের বল, অন্ন লোকের সর্ব্বার্থ সাধক।

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং, অন্নং সর্ব্বার্থ সাধকং।

অন্ন হইতে প্রাণী সকল জন্ম পায়, অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করে। অথবা,

অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ।

জীবন দান অপেক্ষা সংসারে শ্রেষ্ঠ দান আর কি আছে?

জীবদানাৎ পরং দানং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।

জীবন দান অপেক্ষা আর কোন দানই শ্রেষ্ঠ নাই। তাই,

শ্রান্তায় ক্ষুধিতায়ান্নং যঃ প্রযচ্ছতি ভূমিপ।
স্বয়ম্ভুবৎ মহৎস্থানং সগচ্ছতি নরাধিপ॥

মহাভারত।

যিনি শ্রান্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন দান করেন, তিনি স্বয়ম্ভুর ন্যায় মহৎ স্থান প্রাপ্ত হন। এমন কি যে মহাপাপী সে যদি অন্নদান করে, তাহা হইলে সেও পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে।

ব্রহ্মহত্যা কৃতং পাপং অন্নদানাৎ প্রণশ্যতি।
অন্নদঃ পাপকর্ম্মাপি পূতঃ স্বর্গে মহীয়তে॥

রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব।

তাই ভাই আর কিছু কর আর না কর, ক্ষুধিত জনকে এক মুঠা অন্ন দান করিও। মুষ্টি ভিক্ষা উঠাইয়া দিও না। সুশিক্ষিত স্বদেশীয় ভাইগণ, তোমাদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, অন্ন ভিক্ষা দান উঠাইয়া দিও না। এই ভিক্ষা, এই নিষ্কাম দান, দয়ার রাজত্বে প্রধান আইন, প্রাচীন হিন্দুদিগের দয়াময় হৃদয়ের স্বর্গীয় স্ফূর্ত্তি। এই ভিক্ষার উপর আমাদিগের অধ্যয়ন বল, অধ্যাপনা বল, রাজনীতি বল, পার্থিব জীবন বল, পারত্রিক মঙ্গল বল, সন্ন্যাস বল, সকলই স্থাপিত ছিল। তাই বলি, ভিক্ষুকগণকেই ঘৃণা করিও না, ব্রাহ্মণের যে দিন উপ-নয়ন হইল, সেই দিন হইতে, "ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং দেহি" বলিতে লাগিলেন। গুরুর গৃহে থাকিয়া প্রতিদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অধ্যয়ন কার্য্য করিতে লাগিলেন। গুরুও বিনা বেতনে ভিক্ষোপজীবী হইয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ব্যবস্থাপক পরিচালক হইয়াও ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার মহিমা অদ্য কয় জন বুঝেন?

"দেখ বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন সেটী কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা।" (ধর্ম্মতত্ত্ব)

তাই বলিতেছিলাম, যাঁহারা রাজনীতির শিক্ষক, পার্থিব জীবনের নিয়ামক, পারত্রিক মঙ্গলের পথ প্রদর্শক ছিলেন, সেই পবিত্র ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাজীবী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ছাড়িয়া বৌদ্ধগণের জীবন দেখুন। যাঁহারা বুদ্ধ, সমাজের শিক্ষা ও মুক্তি দাতা তাঁহারা ভিক্ষু। এদিকে ভিক্ষুকগণকে সমাজে অন্ন ভিক্ষা, পার্থিব জীবনের অবলম্বন দিতেন; অন্যদিকে বুদ্ধগণ সর্ব্ববিধ মায়া মোহ হইতে মুক্তি স্বরূপ যে নির্ব্বাণ স্বর্গীয় জীবন লাভের যে উপায়, তাহাই ভিক্ষা দিতেন। যে দিকে দেখ দয়া দয়া দয়া, ভিক্ষা ভিক্ষা ভিক্ষা। যে দিন গিয়াছে সে দিন কি আর আসিবেনা? সে দিনের চিহ্ন-স্বরূপ এখনও আমাদিগের দেশে মুষ্টি ভিক্ষা প্রথা কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে। সেই মুষ্টি ভিক্ষা দান ভাল করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া, প্রচলিত করিতে হইবে। দীন দুঃখীদিগের প্রতি মুখ তুলিয়া আবার তাকাইতে হইবে।

৩। শিক্ষাদান।

তপঃ পরং কৃতযুগে, ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্দ্দানমেকং কলৌযুগে
পরাশর সংহিতা। ১।২২

"সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে"।

অন্ন দানের পরেই শিক্ষা দান। গরিব সেবকদলের মধ্যে যিনি যাহা জানেন, অশিক্ষিত গরিবদিগকে তিনি তাহা শিখাইতে পারেন। শিখাইবার উপায় নৈশ বিদ্যালয়, এবং সপ্তাহিক বৈঠক। নৈশ বিদ্যালয়ে অল্প লোক পড়িবার সম্ভাবনা। সমুদয় দিন খাটার পর,রাত্রিতে আবার পড়ার প্ররিশ্রম স্বীকার করিবে এরূপ কৃষক বা মজুর অল্প। তাই যাহাতে, সহজে বিনাকষ্টে মুখেমুখে তাহারা শিক্ষা পাইতে পারে, আহার জন্য প্রতি সপ্তাহে সন্ধার পর, গ্রামের কোন স্থানে, যতগুলি লোক পাওয়া যায়, ততগুলি লোক একত্র করিয়া গল্পের ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যাঁহাদিগের টাকা আছে, তাঁহারা টাকা দিয়া, যাহাদিগের শিক্ষা আছে, তাঁহারা শিক্ষা দিয়া, গরিব সেবার কায চালান, এই প্রর্থনা। যিনি প্রত্যহ বা প্রতি সপ্তাহে দুটী লোককেও নিয়মিত শিক্ষা দিবেন যাহা তাহারা জানে না,এমন প্রয়োজনীয় হিতকর বিষয় তাহাদিগকে জানাইতে থাকিবেন, তিনিই ধন্য,তাঁহার সদনুষ্ঠানের প্রচুর ফসল ফলিবে। পরোপকারের ফসল ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকেই পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা আবাদ করিবার জন্য কোন জমিদারের নিকট পাট্টা লইতে হয় না, কোন গমস্তা বা নায়েবের খোসামোদ করিতে বা "আমলা খরচ" করিতে হয় না।

জমীদারের যিনি জমীদার, ভূস্বামীর উপরেও যিনি ভূস্বামী, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি জমিদার ও স্বামী, তিনি এই সমগ্র পৃথিবী, এই সমুদয় সংসার সৃষ্টি করিয়া, যেন পরোপকারের নিষ্কর ক্ষেত্র, ধর্ম্মের লাখেরাজ জমী আমাদিগকে দান করিয়াছেন। আমরা তাহা আবাদ করিলেই, তাহাতে শ্রমের হল চালনা করিলেই, বীজ বুনানী করিলেই প্রচুর সু ফসল ফলিবে। তাই, আইস, পরোপকারের কৃষাণ ভাই, গরিব সেবক ভাই, চল আমরা মাঠে যাই বেলা হইল, সময় যাইতেছে।

৪। গরিব ব্যাঙ্ক।

"তোমার টাকা আছে। আমার টাকা নাই। তুমি কিন্তু খাটিতে পার না। আমি খাটিতে পারি। তুমি টাকা খাটাইতে পার না, আমি টাকা খাটাইতে পারি। কিন্তু আমি খাটাইব কি করিয়া? আমার যে টাকা নাই। আমি গরিব কৃষাণ খাটিয়া খাইতে চাহি, চাষবাস করিয়া সংসার চালাইতে চাহি। কিন্তু পারি কই? চাষ করিতে হইলে যে জমি চাহি, জমিদারকে খাজানা না দিলে যে জমি পাই না। আমার টাকা নাই, খাজানা কেমন করিয়া দিব? চাষ করিতে হইলে, লাঙ্গল চাহি, গরু চাহি, বীজ চাহি। আমি এ সকল পাই কোথা? আমার যে টাকা নাই। যদি তুমি এখন আমাকে টাকা ধার দেও, আমি সেই টাকা দিয়া জমি লইয়া, লাঙ্গল ও গরু কিনিয়া, চাষ করিয়া, ফসল হইলে, ফসল বেচিয়া তোমার টাকা শোধ করিব, এবং সেই ফসল হইতে আমার দিন গুজরান হইবে, আমি দুই মুটা খাইয়া বাঁচিব। তুমি আমাকে টাকা অমনি ধার

দিবে কেন ? দয়া করিয়া ! অতদূর দয়া তোমার নাই ? তুমি কিছু লাভ না পাইলে আমাকে টাকা ধার দিবে না ? আচ্ছা, বেশ, আমি সুদ দিব। তাহাতে তোমারও লাভ হইবে, আমারও লাভ হইবে। তোমার লাভ অর্থ বৃদ্ধি, আমার লাভ জীবন রক্ষা। আমি তোমার টাকা ধার না লইলে তোমার টাকা খাটিবে না, তাহার বৃদ্ধি হইবে না ; তুমি আমাকে টাকা ধার না দিলে আমার খাইবার উপায় হইবে না। তুমি টাকা ধার দিয়া আমার জীবন রক্ষার বিষয় সাহায্য করিবে সুতরাং তোমাকে আমি "মহাজন" বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমার খাতাতে আমার নামে হিসাব পত্তন করিলে, আমি তোমার "খাতক" হইব।

ফসল হইলে যে তোমার কর্জ্জ শোধ করিব, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ? বিশ্বাস (Credit) তুমি বলিতেছে, পূরা বিশ্বাস হইতেছে না। ভাল, লেখা পড়া করিয়া লও, এই খত লিখিয়া দিলাম। লিখিয়া লইলে বটে, তবু তুমি সুদ সমেত আসল টাকা পাইবে, এই বিশ্বাসে আমাকে টাকা কর্জ্জ দিলে। ঐ বিশ্বাসটুকু না থাকিলে তুমি আমাকে টাকা কর্জ্জ দিতে না, সুদও পাইতে না। আমি খাইতে পাইতাম না, তোমার টাকাও খাটিত না।

তাইত, বিশ্বাসের কি মহিমা! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে, ধর্ম্ম হয় না। পরোকারে বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ হয় না। স্ত্রীজাতিতে বিশ্বাস না থাকিলে প্রণয় হয় না। কৃষাণে বিশ্বাস না থাকিলে কর্জ্জ দেওয়া হয় না, চাষ হয় না। বিশ্বাসে সংসার চলিতেছে, বিশ্বাসে টাকা চলিতেছে, মূলধন এক হাত

হইতে আর এক হাতে যাইতেছে, অশ্রমীর হাত হইতে শ্রমীর হাতে যাইতেছে। শ্রমীর নিকট গিয়া মূলধন নূতন ধন প্রসব করিতেছে, ধরাকে শস্যময়ী হাস্যময়ী আনন্দময়ী অন্নপূর্ণারূপিণী করিতেছে। কিন্তু তাহাতেও যে শ্রমী কৃষাণ ভাইয়ের দুঃখ ঘুচিতেছে না, পেটে দুই বেলা অন্ন যাইতেছে না, হাঁটু তক্ কাপড় পড়িতেছে না। কেন? ভাই কৃষাণ, তুমি বৈশাখের রৌদ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া, ক্ষেতে সারাদিন মেহনত করিয়া যে প্রচুর ফসল জন্মাইলে, তাহা কে কাড়িয়া লইয়া যাইল? তুমি মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছ, তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কাঁদিতেছে। কেহ তোমাদিগকে কাঁদাইয়াছে? কি? মহাজন ও জমিদার তোমার প্রায় সমুদয় ফসল লইয়াছে। মহাজনের সুদ, এবং জমিদারের খাজানা দিতেই ফসল সব ফুরাইল। "মহাজনকে" তোমার রক্ষক বলিয়াছিলে, এখন দেখিতেছ, যে রক্ষক সেই ভক্ষক। গরিব কৃষাণ এইরূপ মহাজনের হাত হইতে কিসে নিস্তার পাইতে পারে স্বদেশ প্রেমিকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন। ভারতবর্ষের কংগ্রেসের এক সনের সভাপতি ওয়েব (Webb) সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস হইল কংগ্রেসের মুখপাত্র (India) নামক কাগজে মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমিলুন এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছিল, নব্যভারতে জমিদারগণের কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এ বিষয় লিখিয়াছিলাম। Court of Wardsর অধীন জমীদারীগুলিতে এখন টাকা উদ্বৃত্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়। তাহা না করিয়া যদি ঐ টাকা হইতে শত করা ৬৲ বা ৯৲ বা ১২৲

টাকা সুদে প্রজাদিগকে কর্জ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও প্রজারাও বাঁচে, নাবালক জমিদারও কোম্পানির কাগজের অপেক্ষা দ্বিগুণ বা তিন গুণ সুদ পান। এ বিষয় ষ্টেট্‌সম্যান নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বেহারে এক বিলাতি কোম্পানি (Messrs Mylno & Co. তাহাদিগের জগদীশপুর জমীদারিতে কিছুকাল কৃষি-ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন। তাঁহারা বার্ষিক শতকরা ১২৲ সুদে টাকা কর্জ্জ দেন। আদায় অনাদায় উভয়ে গড় পড়তা ধরিলে তাঁহাদিগের শতকরা ৮৲ বা ৯৲ টাকা করিয়া লাভ হইতেছে। বাঙ্গালী জমীদারগণের মধ্যে এইরূপ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার উদ্যোগ আমরা অদ্যাপিও বড় দেখিতে পাই না। "জমীদারী পঞ্চায়ত সভা" এ বিষয় চেষ্টা করিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু করিয়াছেন কি না, তাহা ঠিক জানি না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জমীদারগণের শিক্ষা ও প্রজাসহানুভূতি যেরূপ অল্প, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট বড় অধিক ভরসা হয় না।

যে সকল লোক দেশের উন্নতির জন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন, দেশের জন্ত প্রভূত শ্রম, করিতেছেন, তাঁহারা এই মঙ্গল কার্য্যের সূচনা করিবেন আমরা আশা করি। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেমন রাজনীতির দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, তেমনি একবার প্রজানীতির দিকে দৃষ্টি করুন। এমন অনেকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে রাজার দ্বারস্থ না হইয়া, প্রজার মধ্যে খাটিয়া আমারা দেশের মহীয়সী উন্নতি করিতে পারি। সেই গুলি আর উপেক্ষা করিলে

দেশের মঙ্গল নাই। সেই গুলি উপেক্ষা করিলে, কংগ্রেস প্রভৃতির মহৎ উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না।

আমাদিগের দেশের কৃষকগণ অতিশয় গরিব। এখানে মহাজনের সুদও অতিশয় অধিক। এখানে অল্প সুদে কর্জ্জ না পাইলে কৃষক কেমন করিয়া বাঁচিবে।

কৃষকগণ অল্প সুদে কর্জ্জ পাইলে, দেখিবে, তাহাদিগের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে, তাহাদিগের ঘরে লক্ষ্মীদেবী আসিবেন। যে যে দেশে কৃষকেরা অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে, সেই সেই দেশের কৃষকগণের কেবল মাত্র দারিদ্র্য মোচন হয় নাই; অন্য সকল বিষয়েও তাহাদিগের বিস্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে।

জর্ম্মনি, অষ্ট্রিয়া, রুষিয়া, ইটালি দেশে গরিবদিগের সাহায্যের জন্য অনেক গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কৃষকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম সুদে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে। শ্রীযুক্ত উল্‌ফ (Mr. H. Wolff) দেশে দেশে গিয়া গরিবদিগের ব্যাঙ্ক বিষয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার (Popular Banks) নামক একখানি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টাররিভিউ নামক সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে একটী অতীব সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, যে গ্রামের কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই গ্রামের অবস্থা ব্যাঙ্কহীন গ্রামের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে।

"Any one acquainted with agriculture can not fail to detect at the very first glance the contest between an Italian village which has no bank and one in which such a bank has been at work a few

years. Where there is such a bank cultivation is sure to be better. Crops look cleaner and heavier. The live stock are better kept. The buildings are in better order. There is, generally speaking less poverty, a look of greater prosperity about both people and farms, and if any visitor has time to look into the social life of the village, he will find that there is a good deal more still to distinguish a "bank" village from an ordinary one, apart from increased economy, sobriety, thrift, and saving. The population appear more independent and better conditioned. Thence that marvellous educating power which has made priests own that the bank in their parish has done more to make good men of their parishowners than all their preaching."

সংক্ষেপে, এই গ্রাম্য কৃষি-ব্যাঙ্ক হওয়ায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে,ঘর বাড়ীর শ্রী হইয়াছে,দারিদ্র্য কমিয়া গিয়াছে, গ্রামের লোক স্বাবলম্বী ও সাধু হইয়াছে। গরিবদিগের এমন হিতকর গ্রাম্যকৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিবার জন্য কি আমরা চেষ্টা করিব না? জর্ম্মনি দেশে গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলিতে ১৫০ ক্রোর টাকা খাটিতেছে, অষ্ট্রীয়াতে ২৫ ক্রোর, রুশিয়াতে ২ ক্রোর, ফরাসি ও ইটালী দেশে গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্কে অনেক টাকা খাটিতেছে। কত কৃষক ইহাতে অল্প সুদে কর্জ্জ পাইতেছে, কত স্থানে ইহাতে কত জনের অন্নের সংস্থান হইতেছে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদিগের যত্নে, দীনজনবন্ধুদিগের শ্রমে এই সকল কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে কি এমন দীনবন্ধু নাই,এই বিষয়ের

প্রবর্ত্তক হইতে পারেন? প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আয়াতনে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়।

প্রথমে, একজন লোক নিজের ৫০০৲টাকাতে ইহার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। তাহার পর তিনি অংশীদার লইতে পারেন। এই মূলধন ক্রমে ৫০০০৲ হইতে পারে। ব্যাঙ্কের কয়েকটী নিয়ম থাকা আবশ্যক। শতকরা ১২৲টাকার অধিক সুদ লওয়া হইবে না। অংশীদারগণ শতকরা ৬৲টাকার অধিক লাভ লইবেঁন না। শতকরা ৬৲সুদের অধিক যাহা আদায় হইবে, তাহা মূলধনে যোগ হইবে। যদি কখন কোন টাকা লোকসান হয়, সুদের এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। এই গেল কর্জ্জ দেওয়ার কথা। এখন টাকা গচ্ছিত রাখার কথা বলিতেছি। ব্যাঙ্কের এইরূপ কোন নিয়ম থাকা উচিত যে, যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তাঁহাদিগের টাকার উপর শতকরা ৬৲বা ৫৲করিয়া সুদ পাইবেন, এবং দুই এক মাস পূর্ব্বে সংবাদদিলে তাঁহারা টাকা তুলিয়া লইতে পারিবেন। এই গচ্ছিত টাকা ও ব্যাঙ্ক শতকরা ১২৲সুদে খাটাইবেন। যদি গড়পড়তা শতকরা ৯৲টাকা সুদ আদায় হয়, তাহা হইলে এই গচ্ছিত টাকার উপরও ব্যাঙ্কের শতকরা ৩৲বা ৪৲লাভ হইতে পারে,এই লাভও অংশীদারগণ লইবেন না। মূলধন ইহা যোগ করিবেন। কোন টাকা লোকসান হইলে, এই বৃদ্ধি টাকা হইতে তাহা পূরণ হইতে পারিবে। এইরূপ করিলে কোন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর এক পয়সাও কখনও ক্ষতি হইতে পারিবে না। এই ব্যাঙ্ক সুন্দর রূপে চলা আর না চলা, ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। কার্য্যাধ্যক্ষ সৎ ও

কার্য্যপটু হওয়া আবশ্যক। গ্রামের কোন কৃষকের অবস্থা কিরূপ, কাহার চরিত্র কিরূপ, এ সকল বিষয় তাঁহার বিশেষ সন্ধান রাখা আবশ্যক। কাহার নিকট কিরূপ জামিন লওয়া আবশ্যক, তিনিই তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়া স্থির করিবেন। গরিব কৃষকদিগের সম্পত্তি নাই, বলিলেই হয়। সুতরাং সম্পত্তি বন্ধক চাহিলে গরিবদিগের ব্যাঙ্ক চলিবে না। তবে জামিন-স্বরূপ দুইজন অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও সচ্চরিত্র কৃষকের নাম খতে লিখিয়া লইলে যথেষ্ট হইবে। যে কৃষক সচ্চরিত্র, তাহার চরিত্রই উত্তম জামিন। যে ব্যক্তি অলস, মদ্যপায়ী, জুয়াচোর, তাহাকে অবশ্য কার্য্যাধ্যক্ষ টাকা দিবেন না। কৃষক টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহা কি বিষয়ে ব্যয় করে, তাহার প্রতি যথাসম্ভব নজর রাখাও ভাল।

কার্য্যাধক্ষের কার্য্য পর্য্যবেক্ষন ও তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থাকিবে, অংশীদারগণ যাহাকে যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইবেন। যাহাকে যত টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে,তাহার হিসাব সকল অংশীদারের দ্রষ্টব্য থাকিবে। যাহাতে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সঙ্গতিম্পন্ন কৃষক টাকা বাঁচাইয়া ব্যাঙ্কে দিয়া সুদ পায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের Savings Bank আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ৩৸৹ মাত্র সুদ পাওয়া যায়। কৃষিব্যাঙ্কে শতকরা ৬৲ টাকা করিয়া সুদ পাইলে কৃষক ঐব্যাঙ্কে উদ্বৃত্ত টাকা রাখিতে পারে। ইউ-রোপে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকগণ উদ্বৃত্ত টাকা কৃষিব্যাঙ্কে রাখিতেছে। তাহাতে সঙ্গতিসপন্ন কৃষকের টাকা নিঃস্ব কৃষকে কর্জ্জ পাই-তেছে। এইরূপে কৃষকের টাকায় কৃষকের সাহায্য হইতেছে।

এই জন্য এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকে কেহ কেহ Brotherly Banking বলিয়াছেন। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ আপাততঃ ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারিবে বা টাকা গচ্ছিত রাখিবে, আমার ততদুর ভরসা হয় না। কিন্তু ব্যাঙ্ক কিছুকাল চলিলে কৃষকগণ ক্রমে দুই এক জন করিয়া ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারে। জর্ম্মনি এবং ইটালিতে গরিবদিগের জন্য যে সব ব্যাঙ্ক চলিতেছে, তাহাতে এতাবৎকাল একজন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর একটী পয়সাও লোকসান হয় নাই। আমরাও যদি ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি রক্ষা করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করি, এবং ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাই, আমাদিগের দেশেও গরিবব্যাঙ্ক চলিতে পারে, এবং বর্ত্তমান মহাজনী প্রণালীরূপ রাক্ষসের মুখ হইতে গরিব কৃষকগণকে রক্ষা করিতে পারি।

জমিদার।

সাবধান।

জমীদারদিগের প্রতি জনসাধারণের পূর্ব্বে যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি ছিল এখন আর তেমন নাই। তাহার কারণ, হিন্দু ধর্ম্মের গুণে ও আধিপত্যে, সে কালের জমীদারগণের সৎকার্য্য ও সদ্ব্যয় ছিল। পূর্ব্বে কোন হিন্দু জমিদারের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই, তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, অতিথিশালা স্থাপন, বৃক্ষ রোপণ করিতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন, প্রচুর বিদায় দিতেন, এবং অনেক লোককে অন্নদান

করিতেন। এই সকল কার্য্যে সাধারণ লোক বিশেষ উপকৃত হইত।

দেবালয়গুলি কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পোষক ছিল, তাহা নহে। ইহাতে কতকগুলি গরিব লোকের আহারের সংস্থান হইত। জমীদার ঠাকুর সেবার জন্য একটা ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। তাহার উপর, ভক্ত গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুরের যে পূজা ও ভোগ দিতেন, তাহাতে ঠাকুরবাটীর আয় কিছু বৃদ্ধি হইত। যেখানে ঠাকুর বাটীর বন্দোবস্ত ভাল, সেখানে কতকগুলি নিঃস্ব অথচ সম্ভ্রান্ত লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। যে দিন কোন ব্যক্তির আহারের কোন সংস্থান নাই, সে দিন অনায়াসে ঠাকুর বাটীর "প্রসাদ" পাইত। ঠাকুর বাটীগুলি গ্রামে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে, ইংলণ্ডের (Poor rate) দরিদ্র করের কার্য্য সম্প্রদান করিত। অথচ ইংলণ্ডে এই দরিদ্র কর পাইতে হইলে, কাঙ্গালের যেরূপ কয়েদীর মত কষ্ট ও অধীনতা স্বীকার করিতে হইত, দেবালয়ে সেরূপ কষ্ট, অধীনতা স্বীকার করিতে হইত না।

এই সকল দেবালয় আবার বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ভাবে, ইংরাজি "ক্লব হাউজের" (Club house) কাজ সংসাধিত করিত। অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে এই সকল দেবালয় গ্রামবাসীদিগের সম্মিলনের স্থান ছিল। এখন যেমন দিবসের ক্লান্তির পর বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের জন্য ইংলণ্ডে, ও ইঙ্গ-ভারতের কোন কোন স্থানে, ভদ্রলোক "ক্লবে" গিয়া থাকেন এবং সেখানে গিয়া আলাপ করেন, তখন বঙ্গদেশে গ্রামবাসীরা, প্রতিদিন বৈকালে দেবালয়ে সমবেত হইয়া, সুখে পরস্পরের সহিত

আলাপ করিতেন। কিন্তু ইংরাজি "ক্লবে"র সম্মিলন যেরূপ সুরাপানে দূষিত হয়, এবং সেখানকার নৈতিক বায়ু যেরূপ আবিল বোধ হয়, ভারতীয় দেবালয়ের সম্মিলন সেরূপ হইত না। পবিত্র স্থানে সম্মিলন হওয়াতে সেখানকার আলাপে অনেকটা পবিত্রতা থাকিত। কোন সময়ে আমি কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী, ক্ষুদ্র চূর্ণীনদীতীরস্থ, শিবনিবাস গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে দেবমন্দিরে একদিন এক রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। সেই ভগ্ন মন্দিরে, সেই নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত-প্রায় গ্রামে, প্রাচীন সমাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয়ে প্রাচীনকালের কি সুখময়ী স্মৃতি উদিত হইতে লাগিল। আহা! সেই প্রফুল্লতাময়, প্রাচুর্য্যময়, স্বাস্থ্যময়, শান্তিময় পবিত্র সমাজ এখন কোথায়? এককালে কতলোকে এখানে ঠাকুরের "প্রসাদ" খাইয়া পরিতুষ্ট হইত। এই শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-নিনাদিত, ধূপ-ধুনা-পুষ্প-চন্দন-সুবাসিত, তটিনী-তরঙ্গ-পরিশীলন-কোমল-সমীর-সেবিত মন্দিরে কত পুণ্যবান্ ভদ্র সন্তান সায়াহ্নে সমবেত হইয়া সদালাপ করিতেন; কত নরনারী ভক্তিভরে পূতচিত্তে এখানে প্রত্যহ পূজা দিতেন।

তাই বলি, সে কালের হিন্দু দেবালয় ধর্ম্মভাবের উত্তেজনা করিয়া, দরিদ্রদিগকে ঠাকুর "প্রসাদ" দিয়া, এবং সায়াহ্নে সম্মিলনের স্থান হইয়া, একাধারে ইংলণ্ডের "চর্চ্চ" Church, "দরিদ্রক্লব," এবং "ক্লবের" কার্য্য প্রকারান্তরে অতি সুন্দর ভাবে অনেকটা সম্পাদন করিত। সুতরাং জমীদারগণ আমাদিগের দেশে চর্চ্চের, "পূয়োর রেটের," "ক্লবের" ব্যয়ভার প্রকারান্তরে নির্ব্বাহ করিতেন।

(২) সে কালে হিন্দু জমীদারগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন, তাহাতে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসিপেরও (Endowment) অনেকটা কাজ করিত। এই সকল নিষ্কর ভূমি হইতে যে আয় উৎপন্ন হইত, তাহাতে অধ্যাপকগণের জীবিকা সহজে নির্ব্বাহ হইত। এবং এই আয় ইংলণ্ডের (Fellowship) ফেলোসিপেরও কার্য্য করিত। জমিদারগণ ক্রিয়া কলাপে অধ্যাপকদিগের যে "বিদায়" দিতেন, তাহাতে অধ্যাপকগণ তাহাদিগের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে পারিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা ছাত্রগণকে আহারও দিতে পারিতেন। সুতরাং ইংলণ্ডের অগ্রসর সংস্কারগণ (Radical এবং Socialists) যে দাতব্য ভোজন সম্বলিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ের (Free Schools with free meals) জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাহা, অন্ততঃ ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের জন্য, এদেশে পুরাকালে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল।

জমীদারগণ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি বা অর্থ দান করিতেন, পণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে বিদ্যা দান করিতেন। সুতরাং জমীদারগণ সেকালে স্বেচ্ছায় এদেশে উক্ত শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এখন সমাজ তাঁহাদিগের নিকট সেই উপকার প্রায়ই পায় না।

তৎপরে, সেকালে ভূস্বামীগণ বিনা আবেদনে, প্রয়োজন বুঝিয়া, ধর্ম্ম কার্য্য মনে করিয়া, জলাশয় খনন করিতেন। জমীদারের কথা দূরে যাউক, জমীদারের ভৃত্যের কিছু অর্থ হইলে, সেও গ্রাম বা নগরবাসীদিগকে জল দান করিতে পারিলে, নিজের জীবন সার্থক মনে করিত। কৃষ্ণনগরে "তারানয়ন

ঘোষের পুকুর" নামক একটী দীর্ঘ বাপী আছে। তারানয়ন ঘোষ কৃষ্ণনগরে মহারাজার একজন খানসামা মাত্র ছিল। সে রাজ সংসারে চাকুরী করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করে। তদ্দ্বারা এই দীর্ঘ বাপী খনন করে। এবং মৃত্যুর সময় সে, যে রাজবংশে চাকুরী করিয়া এই বাপী খনন করিয়াছিল, সেই রাজবংশকে ইহা দান করিয়া গিয়াছে। কবে সেই ইংরাজি শিক্ষায় অনালোকিত, বিনীত ভৃত্য তারানয়ন এই পুষ্করিণী কাটিয়া দিয়া গিয়াছে, আর অদ্য কত ইংরাজি শিক্ষিত লোক ও অন্য কত পুরুষ ও কত স্ত্রীলোক ইহার স্নিগ্ধ জলে অবগাহন করিয়া দেহ সুশীতল করিতেছে, এবং ইহার স্বচ্ছ নির্ম্মল জল পান করিয়া তৃষ্ণা দুর করিতেছে। সেকালকার জমীদারের খানসামা সে সদ্ব্যয় করিত, একালকার কয়জন জমীদার, কয়জন ধনী প্রভু, তাহা করিয়া থাকেন? সেই খানসামা, শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণ; ভৃত্য হইয়াও প্রভু; অনক্ষর হইয়াও শিক্ষিত। ঈদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে, বোধ হয় নাকি, সেকালে জমীদারের খানসামাও একালে জমীদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

তারপর, সেকালকার জমীদারগণ সাধারণের উপকারের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিতেন, এবং ছায়ার জন্য মহাবৃক্ষ সকল রোপণ করিতেন। তখন রাস্তার জন্য জোর করিয়া জমীদারগণের নিকট পথ কর আদায় করিতে হইত না। তখন বর্ম্ম-বৃক্ষের উৎকর্ষের (Arboriculture) জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করিতে হইত না; অথচ পথকরের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত এবং পথের দুই ধারেই নিবিড় পল্লবিত বিশাল বিটপীশ্রেণী সুদীর্ঘ হরিত চন্দ্রাতপের ন্যায় মস্তকোপরি বিরাজ করিয়া, পথিকজনকে সুশীতল ছায়া প্রদান করিত।

সেকালকার জমীদারগণের গৃহে নিত্য যেন অন্নসত্র হইত। প্রতিদিন কতজনকে তাঁহারা অন্নদান করিতেন। জমীদারের বাটীতে আসিলে, কেহ ছুটী অন্ন পাইবে না, এমন কথনই হইত না। তাহার পর বারমাসে তের পার্ব্বণে এবং অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে ভূস্বামীভবনে প্রায় নিয়তই ভোজ হইত, নিত্যই কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ধনী, কি কাঙ্গাল সকলেই চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আহার করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ভূস্বামীগণ যেমন একদিকে করগ্রহণ করিতেন, তেমনি আবার অন্য দিকে নানাবিধ হিতকর কার্য্যে, সাধারণ মঙ্গলে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করিতেন।

জমীদারগণ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, অতিথিশালা স্থাপন করিয়া, অধ্যাপনার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিষ্কর ভূমি ও "বিদায়" দান করিয়া, সাধারণের জন্য জলাশয় খনন, পথ প্রস্তুত ও বৃক্ষ রোপণ করিয়া, লোককে অকাতরে অন্ন দান করিয়া বহুধা সমাজের মঙ্গল সাধন করিতেন। তখন তাঁহাদিগের বিশেষ একটা উপকারিতা ছিল। এখন যে সকল কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দরিদ্র প্রজা পীড়ন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তখন সেই সকল কার্য্য জমীদারগণের গুণে, বিনা পীড়নে, বিনা করে অনায়াসে সুসম্পন্ন হইত।

সুতরাং তখনকার জমীদারগণের প্রতি জনসাধারণের আন্তরিক অনুরাগ, প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এখনকার জমীদারগণের সেই সকল গুণও নাই, সাধারণ লোকের তাঁহাদিগের প্রতি তেমন আর শ্রদ্ধাও নাই। বরঞ্চ যেখানে প্রাচীন ভূস্বামীবংশের স্থানে সদ্যজাত জমীদার উত্থিত হইয়াছে, প্রায় সে

খানেই অত্যাচার। :তাহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। বুনিয়াদি জমীদারগণের মান্য ধন বিতরণ করিয়া, ভূমি দান করিয়া, আধুনিক জমীদারগণের মান্য, ধন সংগ্রহ করিয়া, সৎ বা অসদুপায়ে অন্যের ভূমি আত্মসাৎ করিয়া, একজন বুনিয়াদি জমীদারের সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া দশজন আধুনিক জমীদারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল জমীদারগণ, প্রাচীন বংশের মান্য লাভ লালায়িত হইয়া, আয় বৃদ্ধি করিবার যত্ন করেন। ইংলণ্ডের জমীদারগণ যেরূপে বিজ্ঞানবুদ্ধিবলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৰ্দ্ধিত করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, এই সকল জমীদারগণ প্রায়ই তাহাতে সক্ষম নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক আয়র্লণ্ডের জমীদারগণের ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজা পীড়ন পূৰ্ব্বক, জমীদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রজার এবং সাধারণ লোকের ঘৃণার পাত্র হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি ? এবং আয়র্লণ্ডে যেমন মধ্যে মধ্যেই প্রজা বিদ্রোহ হইতেছে, এবং প্রজারা জমীদার অথবা জমীদারের আমলাকে হত্যা করিতেছে ; এখানেও তেমনি কখন কখন হইতেছে। প্রজাপীড়ক জমীদারের ব্যবহার আশু পরিবর্ত্তিত না হইলে এইরূপ বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড এখানেও বহুল পরিমাণে হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

তাই, যে সকল প্রজাপীড়ক জমীদার আছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলি, "সাবধান"। গরিব প্রজারা ক্ষুধাতে ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। তাহার উপর আবার অত্যাচার করিতে থাকিলে তাহারা ভীষণ বিপ্লবে দেশ ছারখার করিবে। পূৰ্ব্বের ন্যায় জমীদারগণের প্রায়ই সৎকার্য্য ত নাই, বরঞ্চ তাহার উপর

বিলক্ষণ অত্যাচার আছে। এমন কি, যে সকল জমীদারগণ সহরে, ধার্ম্মিক বা দেশহিতৈষী বলিয়া প্রতিপন্ন, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রজার দুর্দ্দশা মফঃস্বলে আপনি দেখিয়া আসুন, তাহাদিগের আর্ত্তনাদে আপনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না; এবং সেকালের জমীদারগণের ধর্ম্মের সহিত একালের জমীদারগণের বিচিত্র ধর্ম্মের তুলনা করিতে পারিবেন।

এখন দেখা গেল, বর্ত্তমান জমীদার শ্রেণীর উপর, না প্রজার অনুরাগ আছে, না জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে তাঁহাদিগের উপর লোকের ঘৃণা জন্মিয়াছে।

অন্যদিকে আবার, গবর্ণমেণ্টেরও বর্ত্তমান জমীদার শ্রেণীর উপর যে শ্রদ্ধা আছে, তাহা বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট জমীদার-গণের উপর নিশ্চয়ই অনুকূল নহেন। কারণ জমীদারগণের স্বার্থ ও অধিকার গবর্ণমেণ্ট দিন দিন সঙ্কুচিত করিতেছেন। তাহার সাক্ষ্য খাজনার আইন। ইহার প্রতি পরিবর্ত্তনের গতি ও উদ্দেশ্য, ভূমির উপস্বত্ব ও প্রভুত্ব ক্রমশঃ জমীদারের হাত হইতে প্রজার হাতে দেওয়া।

গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত কায়মি বন্দোবস্ত করিয়া এখন পস্তাইতেছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলেন, "আমরা গড়িতে গিয়াছিলাম দেবতা, হইল বানর"। ভারতের ইতিহাস লেখক দার্শনিক জেমস্ মিল বলেন, "অব্যবহিত অর্থাৎ প্রকৃত কৃষক-দিগের সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকাণ্ড ভুল করিয়া-ছিলেন, কারণ কৃষিকার্য্যের উন্নতি সকল দেশেই প্রধানতঃ কৃষক কর্ত্তৃক হইয়া থাকে, জমীদারের দ্বারা হয় না"। জেমস্‌মিলের

পূর্ব্ব প্রোক্ত অনাথবন্ধু জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার অর্থনীতি গ্রন্থে ঐ কথার সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও বলেন, বাঙ্গালার কায়মি বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, সেই বন্দোবস্ত কর্ত্তাদিগের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, বর্ত্তমান জমীদারগণ অকর্ম্মন্য খাদক "Useless drones মাত্র। লর্ড কর্ণয়ালিসের জীবনচরিত লেখক, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্, সিটনকার, লর্ড কর্ণয়ালিসের কার্য্য সমর্থন করিতে গিয়া জমীদারগণের পক্ষ কতকটা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যাহাকে উন্নতি-সাধক জমীদার, Improving Land-lords বলে, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই। এ বিষয় দুই পক্ষেই অনেক যুক্তি আছে এবং অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। জমীদারের পক্ষে বলা হয় যে, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে রায়তদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছেন; অথচ তাহাদিগের অবস্থা বাঙ্গালার প্রজার অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্যসমিতির সহিত খাজানার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তথাপি তাহার এত দুর্দ্দশা কেন? ইহার উত্তরে, অপর পক্ষে বলা হয়, সেখানে রায়তদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কায়মি বন্দোবস্ত হয় নাই। এইজন্য সেখানে এত দুঃখ। যদি রায়তদিগের সহিত কায়মি বন্দোবস্ত অর্থাৎ কখন খাজানা বাড়িবে না, এই সর্ত্তে জমা পাকা করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের দুর্দ্দশা হইত না, বরঞ্চ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইত। ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা। জন ষ্টুয়ার্ট মিল আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জমা পাকা হইবে।

কিন্তু আমরা ত বাঙ্গালী, দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছি; জমীদারগণ কি সম্ভবমত উপায়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করেন ?

জমিদারগণের রাজত্ব।

আমি পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, জমীদারগণের বড় বিপদ উপস্থিত, প্রজাগণ, মধ্যশ্রেণীর লোক, গবর্ণমেণ্ট, এবং সমুদয় সভ্যজগতের অগ্রসর দল তাঁহাদিগের প্রতিকূল। এই চারি তোপের মুখে জমীদারগণ অবস্থিতি করিতেছেন। এখন তাঁহাদিগের রক্ষার উপায় কি? বলিতেছি;—রক্ষার উপায়, নিজের কর্ত্তব্য পালন করা। গবর্ণমেণ্টের খাসমহল হইতে যে টাকা আদায় হয়, তাহার শতকরা ১২৲ টাকা উন্নতির জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার মধ্যে শতকরা ১॥০ রাস্তার জন্য, ২৲ স্বাস্থ্যকর উন্নতির জন্য, এবং ৭॥০ সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ এবং নানাবিধ উন্নতির জন্য ব্যয় হইবে, এইরূপ নিয়ম আছে। জমীদারগণের নিজের জমীদারির উন্নতির জন্য এইরূপ একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

মুনাফা, অর্থাৎ সদর খাজানা বাদে জমীদারের যে আয় আছে, তাহার মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া জমীদারী ও প্রজাদিগের উন্নতির জন্য জমীদার ব্যয় করুন। জমীদারগণ পথকর দিতেছেন, সুতরাং রাস্তা নির্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টেরই করা

উচিত। পথকরের টাকা রাস্তার জন্য যাহাতে সমুচিত ভাবে নিজের নিজের জমীদারীতে ব্যয় হয়, যতদূর সম্ভব তৎপক্ষে প্রত্যেক জমীদারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর ইহার উপরে প্রজাদিগের বা চাসের সুবিধার জন্য নিজের মুনাফার শতকরা।০ চারি আনা অংশ রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য জমীদারের ব্যয় করা উচিত। মুনাফার শতকরা ২৲ টাকা গ্রামের স্বাস্থ্যজনক উন্নতির জন্য ব্যয় করা আবশ্যক। ইহাতে কেবল প্রজার সুখ বৃদ্ধি, তাহা নহে, ইহাতে জমীদারের আয় বৃদ্ধিও হইবে। অনেক জমীদারীতে প্রজা ম্যালেরিয়া জ্বরে মরিয়া যাইতেছে, নূতন প্রজা পত্তন হইতেছে না। ঘর ও চাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই সকল বাস্ত জমীর খাজনা পাওয়া যাইতেছে না, "ফৌতে"র মধ্যে পড়িতেছে। "ফৌত" প্রজার মাঠান জমীরও খাজনা আদায় হইতেছে না। প্রজা যতই ফৌত হইবে বা মরিবে, গ্রাম যতই উৎসন্ন যাইবে, জমীদারের আয় ততই কমিবে। এ অতি সহজ কথা। প্রজা রোগে রোগে চিকিৎসার ব্যয়ে সর্ব্ব-স্বান্ত হইলে, অথবা উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে, খাজানা দিতে অসমর্থ হয়। গরুর দুধ পাইতে হইলে যেমন তাঁহাকে বাঁচাইয়া সুস্থ রাখিতে হইবে,তেমনি প্রজার নিকট খাজানা পাইতে হইলে তাহাকে বাঁচাইয়া সুস্থ রাখিতে হইবে, গ্রাম স্বাস্থ্যজনক করিতে হইবে। তাই বলি, বুঝিয়া দেখিলে স্বাস্থ্যকর উন্নতির জন্য যে টাকা ব্যয় হয়, তাহা জমীদারীর আয়ের বৃদ্ধির জন্য ব্যয় হয়, মনে করা যাইতে পারে।

মুনাফার শত করা ২৲ টাকা গরিব প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য জমীদারের ব্যয় করা কর্ত্তব্য। এই শিক্ষা যে কেবল লেখাপড়া

তাহা নহে। প্রজাগণ যাহাতে সুস্থ ও সচ্চরিত্র হয়, নিজের ঘর ও গ্রাম পরিষ্কার রাখিতে শিক্ষা করে, তাহাও ইহার অন্তর্গত।

বাকী শতকরা ৫৻০ টাকা জমীদারীর আয় বৃদ্ধি, অর্থাৎ জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য জমীদার ব্যয় করিবেন।

জমীদার কেবল মুনাফার কিছু টাকা এইরূপে প্রজা ও জমীদারীর উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হইবে না। জমীদার তাঁহার গ্রামের মিউনিসিপালিটী, ডাক্তার, শিক্ষক ও বিচারক, রক্ষক ও পালক, সংক্ষেপে ক্ষুদ্র রাজা—ইহা তাঁহার সদা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এবং সেই মত কার্য্য করিতে হইবে। ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পক্ষে, মঙ্গলকল্পে, জমীদারগণ! তোমাদিগের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অদ্যাপিও অসীম। পূর্ব্বে যেমন তোমরা এক একজন রাজা ছিলে, এখনও তেমনি আছ। পাপস্বেচ্ছাচারিতায়, অনিষ্টসাধনে এখন তেমন স্বাধীন নও বটে, কিন্তু মঙ্গল বিধানে হিতসাধনে তেমনি স্বাধীন আছ। মঙ্গলকল্পে তোমার জমীদারীতে তোমার সিংহাসন এখনও তোমার জন্য খালি রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি সেইখানে গিয়া বসিয়া রাজত্ব করিতে পার। সিংহাসনের পদপ্রান্ত হইতে দয়া ও ধর্ম্মের, জ্ঞান ও জীবনের নির্ঝর নিঃসৃত হউক। তাহার পবিত্র বারিতে রাজ্য ধৌত ও সিক্ত হউক; খাদ্য ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুবিচার বিতরণ করুক। দেখিবে, তোমার প্রত্যেক গ্রাম কেমন এক নবীন দিব্য রূপ ধারণ করিবে। দেখিবে, ধরাধামে কেমন স্বর্গীয় সুখের আবির্ভাব হইবে। দেখিবে, সুস্থ, শিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, পুলকিত প্রজাবৃন্দের হৃদয়মন্দিরে তুমি দেবরাজবৎ পূজিত হইবে। প্রত্যেক গবর্ণ-

মেণ্টকে যেমন অহরহঃ নানাবিভাগে কার্য্য করিতে হইতেছে,—দশভুজার ন্যায় দশ হস্ত দশ দিকে নিয়োজিত করিয়া অশিব ও অশান্তি মহিষাসুরকে পদতলে রাখিতে হইতেছে—তেমনি জমীদারকেও দশদিকে তাহার মঙ্গলময়ী চেষ্টা নিত্য প্রয়োগ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের যত Department বা বিভাগ আছে, জমীদারগণেরও প্রায় তত Department। তাঁহারও মিউনিসিপাল ডিপার্টমেণ্ট, মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট, জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট ও এগ্রিকল্‌চারল ডিপার্টমেণ্ট থাকা উচিত।

১ জমীদারের মিউনিসিপাল বিভাগ। জমীদার ভাল লোক পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করাইয়া যাহাতে গ্রাম পরিষ্কার থাকে, তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। লোকে বাসস্থানের নিকটে মল মূত্র ত্যাগ না করে তজ্জন্য দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গ্রামের একটী ভাল পুষ্করিণী পানীয় জলের জন্য পৃথক রাখা; লোকে স্নান করিয়া বা অন্য প্রকারে তাহা ময়লা না করে; পানীয় জলের পুষ্করিণী না থাকিলে কোন পুষ্করিণী খনন বা পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেওয়া; পানীয় জলের পুকুরের পাশে ময়লা ধুইয়া পুকুরে না পড়ে, তাহার উপায় করিয়া দেওয়া; রাস্তাদি পরিষ্কার রাখিবার জন্য অল্প বেতনে মেহতর রাখা; গ্রামের জল নিকাসের পথ করিয়া দেওয়া—ইত্যাদি নানারূপ স্বাস্থ্যজনক কার্য্যের প্রবর্ত্তক সুশিক্ষিত জমীদারই হইতে পারেন। এবিষয় প্রজাদিগের বদ্ধমূল কুসংস্কার আছে। জমীদারকে খুব আস্তে আস্তে অস্বাস্থ্যজনক কুপ্রথা ক্রমশঃ উচ্ছেদ করিতে হইবে।

২। জমীদারের মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট বা চিকিৎসা বিভাগ। ইহাতে অধিক ব্যয় না করিয়া প্রজাদিগের উপকার করা যায়। এখন গ্রামে হোমিওপ্যাথি জানেন, এমন ভদ্রলোক দুই একজন পাওয়া যায়। এইরূপ লোকের হস্তে বৎসর বৎসর কয়েক টাকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতে দিলে প্রজাদিগের উপকার হয়। যখন বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ মহামারীরূপে দেখা যায়, তখন বিপন্ন গ্রামে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া রীতিমত চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। যদি তাহাও না হয়, গোমস্তা দ্বারা রুবিনীর কর্পূর-আরক (স্পিরিট অব ক্যাম্ফার) বিতরণ করিলে অনেক প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। অতি অল্প ব্যয়ে বিশেষ উপকার হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে শীতকালে একটী গ্রামে সহসা ওলাউঠা রোগ দেখা দিল। মুসলমান প্রজার মধ্যে অধিক লোক মরিতে লাগিল। ঔষধ দিয়া প্রজা রক্ষা করিবার জন্য গোমস্তার উপর জমীদারের কোন হুকুম ছিল না। বরঞ্চ খাজনা আদায় করিয়া এক কিস্তি মোটা চালান দিবার জন্য জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে গোমস্তার উপর বারম্বার কুপিত তাগিদ আসিতেছিল। প্রজাদিগের মধ্যে চতুর্দ্দিকে "হাহাকার, প্রজার ঘরে অন্ন নাই, মলমূত্রলিপ্ত মৃতদেহ রহিয়াছে। গোমস্তা কাহার নিকট খাজনা আদায় করিবে? গোমস্তা ভাবিতেছে যে, খাজানা পাঠাইতে পারিতেছি না; ইহার উপর যদি ঔষধের দরবার করি, তাহা হইলে অমনি বরতরফি পত্র, নেহায়ত পক্ষে, কড়া ধমক আসিবে। গোমস্তা মাথায়

হাত দিয়া বসিয়া থাকিল। প্রজারা মরিতে লাগিল। অবশেষে গোমস্তা জমীদারকে না জানাইয়া, যেরূপে হউক, দোকান হইতে এক শিশি রুবিনির কর্পূরের আরক আনিয়া রোগাক্রান্ত প্রজাদিগকে দিতে লাগিল। যে কয়টীকে রোগের প্রথম সূত্রপাত হইতে এই ঔষধ দিয়াছিল, সে কয়টীরই প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ৵০ দুই আনা ব্যয়ে একটী করিয়া মনুষ্য-জীবন রক্ষা পাইয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা সমেত একটা একটা সমগ্র পরিবারের ভীষণ শোক ও অনাথদৈন্যদশা নিবারিত হইয়াছিল। এইরূপ অতি সামান্য ব্যয়ে যে স্থলে গরিব প্রজার জীবন রক্ষা হয়, সে স্থলেও অনেক জমীদার উদাসীন। কি আক্ষেপের বিষয়! মনুষ্যচরিত্র এত নীচ ও নিষ্ঠুর হইতে পারে!

অপরদিকে আর এক চিত্র দেখ। কয়েক বৎসর হইল রোম মহানগরীতে মহামারী হইল। লোকে যেমন রোগে পড়িতেছে, অমনি মরিতেছে। রোগ আবার সংক্রামক। এই মহামারীর সময় রোগীর দ্বারে দ্বারে ঔষধ হস্তে করিয়া, চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া, এক ব্যক্তি ফিরিতেছেন। ঐ দেখ কেমন মোহনমূর্ত্তি, মুখে কেমন রাজশ্রী, চোখে কেমন নির্ভীক দয়া দেবভাবে দীপ্তি পাইতেছে। উনি কে? উনি ইতালীর রাজা, হংবর্ত্ত; প্রজাপালক, প্রজারক্ষক রাজা, ভীষণ সংক্রামক রোগের ভয়ে এক মুহূর্ত্তমাত্রও ভীত নহে।

ক্ষণ বিধ্বংসীকেঽমুষ্মিন্ কাচিন্তা মরণে রণে"

"ক্ষণ বিধ্বংসী এই শরীর দ্বারা সংগ্রাম ও মরণে চিন্তা কি?"

হিন্দুদিগের এই যে ঋষিবচন, তিনি জীবনে অতি উচ্চভাবে

প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিপালন করিতেছেন। এই জনক সদৃশ রাজর্ষি হংবর্ত্ত না ম্লেচ্ছ? যাউক, সে দুঃখের কথা যাউক। এই রাজা প্রকৃত জমীদার; ভূস্বামী নামে অভিহিত হইবার ইহারই প্রকৃত অধিকার। সকলে হংবর্ত্ত হইতে না পারি, আদর্শ উচ্চ রাখা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের জমীদারগণের এই এই আদর্শ সতত মনে রাখা কর্ত্তব্য।

৩। জমীদারের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বা শিক্ষাবিভাগ। গ্রামে গবর্ণমেণ্ট রক্ষিত যে পাঠশালা আছে তাহা যথেষ্ট নহে। অনেক গ্রামে প্রজারা তাহাদিগের ছেলেদের জন্ম কিছু কিছু বেতন দিতে সম্মত। জমীদার তাহার উপর কিছু সাহায্য করিলে, এই পাঠশালাগুলি বেশ চলিতে পারে। আর জমীদারের গোমস্তার যে মুহুরি থাকে, তাহাকে মাসিক কিছু দিলে, নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। এই শিক্ষা বিভাগে জমীদারের মুনফার উল্লিখিত শতকরা দুই টাকা ব্যয় করিলে, প্রজাদিগের বিলক্ষণ উপকার হইতে পারে। জমীদার যখন নিজে গ্রাম পরিদর্শনে যান, তখন এই পাঠশালাগুলি তিনি নিজে পরিদর্শন করিলে ভাল হয়।

৪। জমিদারের জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট বা বিচার বিভাগ। এখনও মফঃস্বলে কোন কোন জেলায় জমীদারের কাছারীতে প্রজাদিগের মামলার বিচার হয়। এই সকল কাছারীর মোক্তার আছে। বাদী ও প্রতিবাদীকে তাহাদিগের মোক্তারকে এক টাকা করিয়া দিতে হয়। মোক্তার-

গণ জমীদারের নিকট মোক্তারি করিবার ক্ষমতা পান। গবর্ণমেণ্টের আদালতে মক্কেলদিগের যত খরচ ও হয়রাণি হয়, এখানে সে রকম হয় না। অল্প সময়ে এক টাকা মাত্র ব্যয়ে, যাহা হয় একটা বিচার হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রথার আমি সমর্থন করি না। জমীদার তাঁহার প্রতি গ্রামে যদি সালিসী বিচারের উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রজাদিগের বড় মঙ্গল হয়। জমীদার ভাল লোক দেখিয়া দুই জন সালিস নিযুক্ত করিতে পারেন। আর প্রজারা দুই জন লোক নির্ব্বাচন করিতে পারে। এই চারি জনে পঞ্চম ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিলে, যে পঞ্চায়েত স্থাপিত হইবে, তাহা দ্বারা সালিসের সমুদয় কার্য্য হইতে পারে। যে সকল ফৌজদারি মোকদ্দমার রফা হইতে পারে, (Compoundable offence) তাহারও এখানে মীমাংসা বা রফা হইতে পারে।

৫। তাহার পর জমীদারের একটী এগ্রিকলচরাল ডিপার্টমেণ্ট বা কৃষিবিভাগ থাকা উচিত।—তাহাতে জমীদার যাহাতে কৃষি প্রণালীর উন্নতি হইতে পারে,তাহার চেষ্টা করিবেন। কিছু জমী নিজ জোতে রাখিয়া, নিজে আবাদ করিয়া জমীর উর্ব্বরতা শক্তি কিসে বৃদ্ধি হয়, কোনও নূতন শস্যে অধিক লাভ হইতে পারে কি না, গোজাতির উন্নতি কিসে হয়, ইত্যাদি বিষয় অল্প ব্যয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকিবেন। এবং যেখানে লাভের সম্ভাবনা দেখিবেন, তাহা নিজের প্রজাদিগের মধ্যে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

এই প্রকারে জমীদার তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন। এবং প্রজার ও দেশের লোকের নিকট বিশেষ সমাদৃত, সম্মা-

নিত ও পূজিত হইতে পারেন। এবং প্রজার মহাবলে গবর্ণমেণ্টের নিকট বলীয়ান্ হইতে পারেন।

এই রাজত্ব পাইতে হইলে, এখন যাহাকে "জমিদারী বুদ্ধি" বলে, প্রথমে তাহা ত্যাগ করা আবশ্যক। "জমিদারী বুদ্ধি" অর্থে অনেকের নিকট এখন ফিচেল ও ফেরাপি বুদ্ধি, প্রজা-প্রতারক বুদ্ধি বুঝায়। যেমন ভদ্র ও ধার্ম্মিক লোক যতই দক্ষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউন না কেন, তাঁহার পক্ষে পুলিশে কাজ করা বড়ই কঠিন, তেমনি ভদ্র, ধার্ম্মিক ও অকপট ব্যক্তির পক্ষে বর্ত্তমান প্রণালীতে জমিদারীর কার্য্য করা বড়ই কঠিন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে প্রজা যতই সুখে থাকুক না কেন, খাজানা যতই উচিতভাবে আদায় হউক না কেন, সব বিভাগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া মিতব্যয়িতা দ্বারা, অপব্যয় নিবারণ করিয়া, তিনি যত টাকা বাঁচান না কেন, পতিত জমী বিলি করিয়া দিয়া যতই আয় বৃদ্ধি করুন না কেন, সংক্ষেপে, ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে যতই জমিদারীর উন্নতি করুন না কেন—তিনি যদি পরের জমী ফাঁকী দিয়া বা কাড়িয়া লইতে না পারেন, প্রজাকে জব্দ করিতে না পারেন, অধিকাংশ লোকের মতে, তাঁহার "জমিদারী বুদ্ধি" নাই। যে হলপ করিয়া মিথ্যা কহিতে পারে, জাল করিতে পারে, প্রজাদিগের ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারে, উঠান চসিয়া প্রজা তাড়াইতে পারে, ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া নিরীহ মেষবৎ প্রজার নিকট চিরকালের দাসখত স্বরূপ কবুলতি লেখাইয়া লইতে পারে, কায়দায় ফেলিয়া, উৎপীড়নের পেঁচ কসিয়া প্রজার শরীর হইতে যে যত রক্ত রুধির বাহির করিতে পারে—অর্থাৎ এক কথায় যে সেরা বদমায়েস—এখন অনেকের মতে, তাহারই সেরা "জমিদারী বুদ্ধি"।

এইরূপ সেরা "জমিদারী বুদ্ধি" হইতে জগদীশ্বর আমাদিগের দেশের জমীদারকুলকে রক্ষা করুন। কেননা, পাপের দণ্ড আছেই, ইহকালেই হউক, আর পরকালেই হউক। অন্যের মন্দ করিলেই নিজের মন্দ হইবেই হইবে। জ্ঞানী লোক, এই কথা তারস্বরে বলিতেছেন। "No man can do wrong without suffering wrong." এই কথা যে বিষয় কাজের সময় আমাদের মনে থাকে না, এই আমাদের মহা দুর্ম্মতি। আমি চোখের উপর দেখিতেছি—কত পাপিষ্ঠ জমীদারবংশ উৎসন্ন গিয়াছে ও যাইতেছে। আর অদ্য যে সকল জমীদারবংশ পাপে পুষ্ট, জানিবে, তাহাদিগের ধ্বংস ও দণ্ড অতি সন্নিকট।

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	ভিক্ষারি	ভিখারি
৩	যোগ	যোগ
ঐ	যে	যে
৭	প্রণবধ	প্রাণবধ
৮	রোগীবৎ	রোগিবৎ
১০	ব্যকুল	ব্যাকুল
ঐ	অমি	আমি
১৮	জগত	জগৎ
১৯	রত্রি	রাত্রি
২৬	যধ্যে	মধ্যে
৩৫	কলুযিত	কলুষিত
৩৬	অমরা	আমরা
৩৭	গগণ	গগন
ঐ	হঁসিতেছে	হাঁসিতেছে
৪১	Fransis	Francis
৫২	বিদ্য	বিদ্যা
৫২	প্রাঙ্গনে	প্রাঙ্গণে
৫৫	বুদ্ধি	বুদ্ধি
৬২	অডাম	আডামবীড
৬৩	যাত্রীগণ	যাত্রিগণ

পত্রাঙ্ক		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৬৯	...	যুদ্ধ	...	যুদ্ধে
৭১	...	রাজত্ব	...	রাজত্ব
৭৪	...	প্রলুল্ল মুখী	...	প্রফুল্লমুখী
ঐ	...	সাধূনাং	...	সাধূনাং
ঐ	...	সপ্তবামি	...	সম্ভবামি
৭৬	...	পরিস্ফুট	...	পরিস্ফুট
ঐ	...	যোগশাস্ত্রাধ্যায়নে	...	যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে
৮৬	...	বিভাষিত	...	বিভাসিত
ঐ	...	ভবিয্যতে	...	ভবিষ্যতে
৮৭	...	অলোকিত	...	আলোকিত
৮৯	...	বিভাষিত	...	বিভাসিত
ঐ	...	স্বামীচরণে	...	স্বামিচরণে
৯৩	...	চতুষ্পাঠি	...	চতুষ্পাঠী
৯৪	...	পিত	...	পিতা
ঐ	...	কয়েন	...	করেন
৯৫	...	নূতক	...	নূতন
১০০	...	কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়	...	কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ
ঐ	...	যুক্তিহীনে	...	যুক্তিহীন
ঐ	...	সংজায়তে	...	প্রজায়তে
১০৫	...	সম্যগ্	...	সম্যক
১০৭	...	সন্মিলিত	...	সম্মিলিত
১১২	...	অসন্মান	...	অসম্মান
ঐ	...	প্রচান	...	প্রাচীন

পত্রাঙ্ক		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
ঐ	...	ভাযস্তে	...	ভাষন্তে
১১৮	...	প্রার্থক্য	...	পার্থক্য
১২০	...	ভারতবাসীগণ	...	ভারতবাসিগণ
১২৪	...	সত্তেও	...	সত্ত্বেও
১২৯	...	ধর্ম্মহানি	...	ধর্ম্মহানিঃ
১৩২	...	ঐ	...	ঐ
১৩২	...	উদ্গীরণ	...	উদ্গিরণ
১৩৫	...	কারয়েোদ্ধাস্তং	...	কারয়েদ্নাস্তং
ঐ	...	শূদ্রানাং	...	শূদ্রাণাং
ঐ	...	পরোধর্ম্ম	...	পরোধর্ম্মঃ
১৩৬	...	শূদ্রং	...	শূদ্রাদ্
ঐ	...	দ্রব্যোপদান	...	দ্রব্যোপাদান
ঐ	...	সং	...	স্বং
১৪২	...	প্রনিধান	...	প্রণিধান
১৫০	...	পরিবর্দ্ধন	...	পরিবর্দ্ধন
১৫১	...	সচ্ছন্দ	...	স্বচ্ছন্দ
১৫২	...	বাষ্পকুললোচনে	...	বাষ্পাকুললোচনে
১৬২	...	ভগ্নিপতি	...	ভগ্নীপতি
১৬৩	...	মৃক্যুরূপিনী	...	মৃত্যুরূপিণী
১৬৫	...	ধারীগণ	...	ধারিগণ
১৬৭	...	জ্ঞানকর্ম্মোপসনাভি		জ্ঞানকর্ম্মোপাসনাভি
ঐ	...	দেবতারাধণে	...	দেবতারাধনে
ঐ	...	সাস্তং	...	শাস্তং

পত্রাঙ্ক		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১৬৭	...	জিতাত্মনং	...	জিতাত্মানং
১৬৮	...	ভগবদ্গীতায়	...	ভগবদ্‌গীতার
১৬৯	...	শ্রীমতি	...	শ্রীমতী
১৭০	...	জগৎব্যাপী	...	জগদ্ব্যাপী
১৭১	...	বিভাষিত	...	বিভাসিত
১৭৫	...	ঘনিষ্ট	...	ঘনিষ্ঠ
১৭৭	...	নরহত্য	...	নরহত্যা
১৮২	...	য়হ	...	হয়
১৮২	...	হায়	...	হয়
১৮৪	...	স্বর্গ্য	...	স্বর্গ
১৮৬	...	প্রাঙ্গনে	...	প্রাঙ্গণে
ঐ	...	অবতীন	...	অবতীর্ণ
১৮৭	...	থাকিলে	...	থাকিলে
ঐ	...	কামিণীগণ	...	কামিনীগণ
ঐ	...	ভাসুর	...	ভাশুর
ঐ	...	পিসি	...	পিসী
১৮৮	...	ঐ	...	ঐ
ঐ	...	সহানুভুতি	...	সহানুভূতি
১৯০	...	বিলাসীগণ	...	বিলাসিগণ
১৯৩	...	যজ্ঞমিত্যুচুর্দ্দানমেকং		যজ্ঞমিত্যাচুর্দ্দানমেকং
১৯৬	...	ঐ		ঐ
ঐ	...	ত্রেতায়া	...	ত্রেতায়াং
ঐ	...	প্রর্থনা	...	প্রার্থনা

পত্রাঙ্ক		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১৯৮	...	বলিতেছে	...	বলিতেছ
১৯৯	...	সনেয়	...	সনের
২০০	...	আমারা	...	আমরা
২০২	...	গ্রাম্যকৃষিব্যঙ্ক	...	গ্রাম্যকৃষিব্যাঙ্ক
ঐ	...	আমাদিশ্বের	...	আমাদিগের
২০৩	...	আয়াতনে	...	আয়তনে
২০৪	...	পর্য্যবেক্ষন	...	পর্যবেক্ষণ
ঐ	...	কিস্তু	...	কিন্তু
ঐ	...	সঙ্গতিসম্পন্ন	...	সঙ্গতিসম্পন্ন
২০৯	...	সে	...	যে
২১১	...	প্রজা বিদ্রোহ	...	প্রজা-বিদ্রোহ
২১৫	...	সংস্কারের	...	সংস্কারের